বারো ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিতে চার ইমাম

(আবু হানিফা, মালেক, শাফে‘ঈ ও আহমাদ)

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ খালেদ ইবন আহমাদ আয-যাহরানী

অনুবাদ : মুহাম্মাদ নুরুল্লাহ তা‘রীফ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1436

﴿موقف الشيعة الاثني عشرة من الأئمة الأربعة﴾

«أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد»

« باللغة البنغالية »

الشيخ خالد بن أحمد الزهراني

ترجمة: محمد نور الله تعريف

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1436

বার ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিতে চার ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফে‘ঈ ও আহমাদ রহ.

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা অনাদি অনন্ত অশেষ অসীম মহান আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অফুরন্ত রহমতে হেদায়াত দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা তাঁর জ্ঞান ও হেকমতের আলোকে পথভ্রষ্ট করেন। যতদিন আকাশে তারা জ্বলবে, গাঙে জোয়ার আসবে, পাখিরা কলরব করবে সে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তেমনিভাবে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁদেরকে অনুসরণ করে চলবেন তাদের সকলের প্রতি।

খুলাফায়ে রাশেদার সেই সোনালী যুগের শেষ লগ্নে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য বিনষ্ট করেছে দুটি বাতিল ফেরফা। তাদের একটি ছিল খারেজী, অন্যটি শিয়া। প্রথমটি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঢামাডোল বাজিয়ে এবং দ্বিতীয়টি আহলে বাইতের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের মাধ্যমে উম্মাহকে বিভক্ত করে। মূলতঃ এ দুটির কোনটি সঠিক পথ নয়। যেহেতু ইসলাম মধ্যমপন্থার দীন। নয় অতিরঞ্জন, নয় শিথিলায়ন। কালের পিঠে চড়ে উম্মাহ্ অনেক দূর

পাড়ি দিলেও আজো আমরা এ দুটি ফেতনার যাঁতাকলে পড়ে পিষ্ঠ হচ্ছি। ইদানিংকালে বিশ্বব্যাপী শিয়া মতবাদের নব উত্থান, নতুন উদ্যম দেখে আসন্ন ভবিষ্যতের ব্যাপারে মন শংকিত হয়ে উঠে। মনে পড়ে যায় ফাতেমীদের দুষ্কর্ম, আর তাতারদের নিষ্ঠুরতার নানা চিত্র। শিয়াদের মধ্যে রয়েছে নানা উপদল। তাদের কোনো উপদলের আকীদা-বিশ্বাসই গোমরাহী মুক্ত নয়। তদুপরি বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রভাববিস্তারকারী বারো-ইমামের মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার দাবীদার শিয়াদের এ উপদলটির আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত জঘন্য এবং সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী। যার ফলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাথে তাদের শত্রুতা সবসময় তুঙ্গে এবং হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামরা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বিগত কয়েক বছর ধরে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বারো-ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবীদার (ইমামিয়া) শিয়াদের তোড়জোড় ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অভিবাসী হিসেবে আসা সুন্নী মুসলিমরা এই শিয়াদের দ্বারা নানাভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে। ‘তাকিয়া’ দর্শনকে কাজে লাগিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা নিরীহ, সরলপ্রাণ, সাধারণ মুসলিমকে

হরহামেশা বিভ্রান্ত করে থাকে। তাই তাদের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করা এখন সময়ের দাবী। শায়খ খালেদ ইবন আহমাদ আয-যাহরানী তার "মাওকিফুশ শিয়া আল ইসনা আশারিয়া মিনাল আয়িম্মাতিল আরবা'আ" গ্রন্থে আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহর ব্যাপারে বারো-ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবীদার শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি দলীল-প্রমাণসহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সে মূল্যবান গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ করে পাঠকের হাতে সোপর্দ করলাম। বন্ধুবর মাসউদুর রহমান নূর বইটির প্রুফ দেখে দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। সুধী পাঠক বইটি পড়ে উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ্ তাআলা এই আমলটুকুকে কবুল করে নিন এবং আমাদের সকলকে তাঁর হেদায়েতের উপর অটল রাখুন। আমীন।

মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ তারীফ

মদীনা মোনাওয়ারা

১৬ শাওয়াল, ১৪২৯ হিজরী

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা‘আলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলদের শ্রেষ্ঠ, নবীদের সেরা, সত্যবাদী, আমানতদার মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ্‌র উপর। তেমনিভাবে নবীর পরিবার-পরিজন, তাঁর বংশধর ও সাহাবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের সকল অনুসারীরও উপর

এটা সুবিদিত যে, বিদ‘আতের উদ্ভব ঘটে অজ্ঞতার ছায়ার নীচে, নবীর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ থেকে দূরে সরে গেলে। আমাদের এ যুগে যে বিদ‘আতটির দুর্দান্ত প্রতাপ, প্রচণ্ড দাপট তা হল তথাকথিত বারো-ইমামের মতবাদে বিশ্বাসী শিয়াদের বিদ‘আত। এ গবেষণাধর্মী পুস্তিকাতে আমরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের অর্ন্তভুক্ত চার মাযহাবের ইমাম ‘আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ ইবন হাম্বল’ রাহিমাহুমুল্লাহ্‌র ব্যাপারে তথাকথিত বারো-ইমামের মতবাদে বিশ্বাসী শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করব। যেহেতু মহান সাহাবীদের পরবর্তী স্তরে যেসব ব্যক্তিবর্গের প্রতি তথাকথিত বারো-ইমামের মতবাদে বিশ্বাসী শিয়াদের অপবাদ অত্যন্ত বেপরোয়া পর্যায়ের তারা হলেন এ চারজন ইমাম। যে চার ইমামের

প্রশংসায় চার দিগন্ত মুখরিত, যাদের ইলম গোটা পৃথিবীময় প্রসারিত। যারা আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ থেকে উৎসারিত ফিকহী মতগুলো আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। যুগের পর যুগ যাদেরকে অনুসরণ করেছেন অসংখ্য ইলমী মতাদর্শের অনুসারীরা। যারা আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। যে জ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করেছেন কুরআন-সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কেরামের ফিকহ থেকে তারা যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন তার আলোকে। ইমাম আবু হানীফার রাহিমাহুল্লাহ কথাই ধরা যাক না, তিনি ইরাকে ইবনে মাসউদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ফিকহী দর্শন রেখে যান। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ তিনি মদীনার আলেমদের ইলমী দর্শন রেখে যান। যাদেরকে খেতাব দিতে গিয়ে বলা হয় ‘ইসলামের আকর’ এবং ‘শ্রেষ্ঠ মানবের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশী’।

এই রিসার্চ পেপারে আমরা এটা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, বারো-ইমামিয়াদের মতবাদটা পঞ্চম কোনো ফিকহী মাযহাব নয়। কেউ যেন তা ভেবে ভুল না করে। বরং আমরা বলব সুন্নী চার ইমামের সকলে ইসলামের মূল দর্শনে (আকীদা-বিশ্বাসে) সম্পূর্ণ একমত এবং

রাফেযীরা (বার-ইমামের অনুসারীরা) যে বিদআতী- এ ব্যাপারেও তারা সকলে একমত।

প্রিয় পাঠক, আমি এ পুস্তিকাতে সুন্নী মাযহাবের চারজন ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ্‌র ব্যাপারে তথাকথিত বারো-ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি উদঘাটনে গবেষণা চালিয়েছি। এ বিষয়ে আমি এখনও গবেষণা করে যাচ্ছি। এ গবেষণা করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন পাবলিক লাইব্রেরী এবং ব্যক্তিগত পাঠাগারগুলোর শরনাপন্ন হয়েছি। এমনকি তথাকথিত বারো-ইমামের মতবাদে বিশ্বাসী কিছু বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকেও আমি এমন কিছু রেফারেন্স গ্রন্থের তথ্য পেয়েছি যে বইগুলোতে এই ইমামদের প্রতি এই ফেরকার লোকদের চরম শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তথ্যসূত্রের কোনোপ্রকার বাছ-বিচার না করে তারা হরদম একে অপরের কাছ থেকে সেসব বিদ্বেষপূর্ণ বর্ণনাগুলোর উদ্বৃতি দিয়ে থাকে। তাদের অনেকের সাথে আলাপচারিতা ও সংলাপের পর আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এসব পুস্তকে যেসব অপবাদ ও কটূক্তি রয়েছে তাদের অনেকে সেসব মনোভাব পোষণ করে। যদিও প্রথম দিকে তাদের কেউ কেউ এই বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত

যে, তাদের ইমামদের পক্ষ থেকে যেসব নিন্দাবাদ ও তিরস্কার রয়েছে তা শুধু "ওহাবী মতবাদ" এর বিরুদ্ধে; তারা সুন্নীদের চার ইমামকে এবং তাদের ছাত্রদেরকে সম্মান করে!!

এরপর আমার একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আসলে তথ্য-উপাত্ত ছাড়া এদের অনেকের সাথে আলোচনা করে লাভ নেই। প্রত্যেক ন্যায়বান ব্যক্তিই জানেন- সুন্নী এই চারটি মাযহাবের জন্ম হিজরী দ্বিতীয় শতকে। আর শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহ্হাবের[1] বহিঃপ্রকাশ ঘটে হিজরী ত্রয়োদশ শতকে!!

তারপর আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে এই পুস্তিকা লেখার জন্য ইসতিখারা করলাম। এই পুস্তিকা সম্পূর্ণ গবেষণালব্ধ এবং যুক্তিপ্রমাণ নির্ভর। আল্লাহ্ তাআলার কাছে

"আল ইমাম মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহ্হাব ওয়া আয়িম্মাতুদ্ দাওয়া আননাজদিয়া ওয়া মাওকিফুহুম মিন আ-লিল বাইত (আঃ)" এই শিরোনামে আমার একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। সে কিতাবে আমি বর্ণনা করেছি যে, আহলে বাইতের সদস্যদেরকে সম্মান দেওয়া ও তাদেরকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে নাজদী আলেমদের তুলনা হয় না।

এই দো'আই করি তিনি যেন প্রতিটি ভ্রান্ত পথের যাত্রীকে সঠিক পথ দেখান।

আর আল্লাহ সালাত ও সালাম প্রেরণ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ), তার পরিবার-পরিজন, তার সাহাবীদের উপর।

লেখক

খালেদ ইবন আহমাদ

আযযাহরানী

মুহাররাম ১৪২৭ হিঃ

kzahrany@hotmail.com

প্রথম পরিচ্ছেদ:
চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইমাম আবু হানীফা নু'মান (রাহিমাহুল্লাহ)[2] [৮০-১৫০হিঃ]

বংশ পরিচয়: তিনি ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবন সাবিত। পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃপুরুষ ছিল কাবুলের বাসিন্দা। কাবুল বিজয়ের সময় তাঁর পিতামহ মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ যদিও তিনি কোনো গোত্রের মাওলা বা তাদের সাথে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি বা তাঁর পিতা কখনো গোলাম ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন স্বাধীন।

জন্ম ও শৈশবকাল: অধিকাংশ বর্ণনা মতে হিজরী ৮০ সালে আবু হানীফা কূফাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর শৈশবকাল কাটে এবং সেখানেই তিনি বড় হন। ইলম অর্জন ও বিতরণের মহানব্রতে জীবনের বেশিরভাগ অংশ তিনি কূফাতেই কাটান।

ইমাম মুহাম্মদ আবু যাহরার "ইমাম আবু হানীফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু আ-রাউহু ওয়া ফিক্‌হুহু" শীর্ষক গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়ে এই জীবনী লেখা হয়েছে।

তাঁর পিতা ‘সাবিত’ও মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয় ছোটবেলায় তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য এবং তার অনাগত বংশধরদের জন্য বরকত লাভের দো‘আ করেছিলেন।

আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বেড়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে। তিনি তাঁর জীবনযাত্রা শুরু করেন একজন ব্যবসায়ী হিসেবে। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ও চিন্তার তীক্ষ্নতা দেখে ‘ফিকহুল হাদীসের’[3] উপর পণ্ডিতব্যক্তি ইমাম শা‘বী তাকে ব্যবসায়ের সাথে সাথে আলেমদের মজলিসে হাজির হওয়ার পরামর্শ দেন। এভাবে তিনি ইলমের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু সাথে সাথে ব্যবসার কাজও চালিয়ে যান।

ইলম অর্জন: তাঁর সময়কালে ইসলামী জ্ঞানের যেসব শাখা বিদ্যমান ছিল সেগুলোর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তিনি তার ইলমী জীবন শুরু করেন। ‘কুরআনে কারীম’ মুখস্থ করেন (আসেমের রেওয়ায়েত

ফিকহুল হাদীস: যে শাস্ত্রে হাদীসের গ্রন্থগুলোর বিন্যাসের আলোকে ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হয়।- অনুবাদক

অনুযায়ী)। হাদীস অধ্যয়ন করেন। আরবী ব্যাকরণ (নাহু), আরবী সাহিত্য ও আরবী কাব্যের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া ইসলামী-আকীদা ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে তিনি বাতিল ফেরকাবাজদের সাথে বিতর্কসভায় অংশ গ্রহণ করতেন। এরপর ফিকহের (ইসলামী আইন শাস্ত্র) জ্ঞান অর্জনে নিমগ্ন হন এবং ফিকহের সাথে লেগে থাকেন। এমনকি তাঁর সকল চেষ্টা-সাধনা এ জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করে যান। গভীরভাবে পড়াশুনার জন্য তিনি ফিকহশাস্ত্রকে কেন বেছে নিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি এ ইলমকে নিয়ে যতবেশী নাড়াচাড়া করি, যতবেশী পড়াশুনা করি এর মর্যাদা ততবেশী স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে... আর আমি দেখতে পাচ্ছি- এ জ্ঞান ছাড়া ফরয ইবাদত আদায় করা সম্ভব নয়, দীনে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়, ইবাদত-বন্দেগী করা সম্ভব নয়। এমনকি এই জ্ঞান ছাড়া দুনিয়া-আখেরাত কোনোটাই পাওয়া সম্ভব নয়।" এরপর আবু হানীফা সে যামানার বড় বড় আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে 'ফতোয়া' নিয়ে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যান। ২২ বছর বয়স থেকে তিনি তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবু সুলাইমানের সান্নিধ্যে থাকেন। আবু হানীফার বয়স যখন ৪০ বছর

তখন শায়েখ হাম্মাদ মারা যান। ততদিন পর্যন্ত আবু হানীফা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন।

তাছাড়া মক্কা ও মদীনায় বসবাসরত অন্যান্য ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসদের কাছ থেকেও আবু হানীফা ইলম নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ তিনি খুব বেশী হজ্জে আসতেন। হজ্জে আসলে হারামাইনের আলেমদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন, ফিকহ নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তারা যেসব 'সনদ' (হাদীসের বর্ণনাসূত্র) এ হাদীস বর্ণনা করতেন সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করতেন।

তিনি তাবেয়ীদেরকে খুঁজে বের করতেন, তারা যেখানেই থাকুন না কেন। বিশেষতঃ তাবেয়ীদের মধ্যে যারা সাহাবীদের সান্নিধ্যে থেকে 'ফিকহ' শাস্ত্রে ও 'ইজতিহাদে' ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাদেরকে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'উমর, ইবনে মাসউদ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ছাত্রদের কাছ থেকে আমি তাদের ফিকহী জ্ঞান গ্রহণ করেছি।"

চল্লিশ বৎসর বয়সে আবু হানীফা কূফার মসজিদে তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী জ্ঞান দান শুরু করেন। তাঁর

কাছে যেসব ‘ফতোয়া’ ও ‘বিচার’ আসত তিনি ছাত্রদের কাছে সেসব মাসয়ালার সমাধানগুলো বিশ্লেষণ করতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে প্রত্যেকটি মাসয়ালাকে তার সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য মাসয়ালার সাথে তুলনা করতেন। এভাবেই তিনি ইসলামী আইন (ফিকহ) শাস্ত্রের বিধি-বিধান নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি দাঁড় করাতে সক্ষম হন। যা থেকে বেরিয়ে আসে ‘হানাফী মাযহাব’।

তাঁর আখলাক: আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার-পরহেযগার, খুব বেশী ইবাদতগুজার। তিনি দিনে রোজা রাখতেন, রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং প্রচুর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত ব্যক্তি। একাধারে ত্রিশ বছর তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েছেন। কুরআন ছিল তার সবসময়ের সাথী, একান্ত বন্ধু।

তাঁর অন্যতম গুণ ছিল সহিষ্ণুতা ও বদান্যতা। ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর হাতে প্রচুর অর্থ আসত। যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার এবং যৎসামান্য লাভে ব্যবসায়িক লেনদেন করতেন। তাঁর সম্পদের বেশীরভাগ অংশ তিনি আলেম-ওলামা ও মুহাদ্দিসদের জন্য ব্যয়

করতেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এ দান করতেন।

ফুযাইল ইবন ইয়ায তাঁর ব্যাপারে বলেন, “আবু হানীফা ছিলেন একজন বিজ্ঞ লোক, ফিকহ শাস্ত্রে নামকরা আলেম, অঢেল সম্পদের মালিক। তাঁর কাছে তশরীফ নেয়া কাউকে কিছু না-দিয়ে বিদায় করতেন না। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে রাতদিন ইলম অর্জনে মশগুল থাকতেন। তিনি ছিলেন রাতগুজার, অল্পভাষী, অতি নীরব। কিন্তু হালাল-হারামের সাথে সম্পৃক্ত কোনো মাসয়ালা উত্থাপিত হলে তিনি মুখ খুলতেন এবং সঠিক মতের পক্ষে সুন্দরভাবে দলীল পেশ করতেন। রাজা-বাদশাহ্র সম্পদ থেকে তিনি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন।

তাঁর ইল্মী মর্যাদা ও ইলমের সূত্র: আবু হানীফা ছিলেন একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ফিকহবিদ। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি একটি স্বতন্ত্র পথে চলেছেন এবং এ অঙ্গনে গভীরতা অর্জন করেছেন। এ কারণে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মুখে তাঁর স্তুতির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। জনৈক আলেম বলেন, ‘আমি আবু হানীফার সান্নিধ্যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। তাঁর চেয়ে বেশী সময় নীরব থাকে এমন আর কাউকে

আমি দেখিনি। কিন্তু যখন ফিকহের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হত তখন তিনি ছিলেন উপচেপড়া পানিতে ভেসে যাওয়া উপত্যকার মত। তাঁর গুনগুনানি শব্দ এবং উচ্চকণ্ঠ দুটোই আমি শুনেছি।” তাঁর সমসাময়িক পরহেজগার, তাকওয়াবান আলেম আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক বলেন, “তিনি হচ্ছেন ইলমের মস্তিষ্ক। তিনি ইলমের নির্যাস পেয়েছেন এবং তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পেরেছেন।”

তাঁর গুণাবলী: আবু হানীফার এমন কিছু গুণ ছিল যে গুণগুলো তাকে আলেমদের শীর্ষে পৌঁছিয়েছে। ঠিক একজন হাক্কানী, নির্ভরযোগ্য আলেমের যেসব গুণ থাকা উচিত। তিনি ছিলেন সুপ্রসন্ন চিন্তার অধিকারী। খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি জানতেন। তড়িৎ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

নিজেকে সংযত রাখতে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তাঁকে লক্ষ্যকৃত কোনো বিদ্বেষপূর্ণ কথায় তিনি কান দিতেন না। কোনো কটু কথা তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। তিনি বলতেন, “হে আল্লাহ্, যাদের অন্তরে আমাদের স্থান হয়নি, আমাদের অন্তর তাদের জন্য রয়েছে প্রসারিত।” তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। এ কারণে তাঁর নিজস্ব কোনো মত কুরআন, হাদীস বা

কোনো সাহাবীর ফতোয়ার বিপরীতে না গেলে তিনি তা পরিহার করতেন না।

‘হক্ক’ সন্ধানে ছিলেন একনিষ্ঠ, অকপট। যা তার হৃদয় ও বিবেককে আলোকিত করেছিল। হারজিত যাই হোক না কেন ‘হক্ক’টাকেই তিনি গ্রহণ করতেন। এ একনিষ্ঠতার কারণে তিনি নিজের মতটাকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং বলতেন, “আমাদের বক্তব্যটা একটা মতামত মাত্র। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি। কেউ যদি আমাদের মতের চেয়ে উত্তম কোনো মত নিয়ে আসে তাহলে সেটা হবে আরো বেশী যথাযথ।”

এসব মহান গুণাবলীর কারণে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এমন একজন ফকীহ ছিলেন যিনি নাগালে পাওয়া সব ধরনের আত্মিক খাদ্য (ইলম) থেকে উপকৃত হতে পেরেছেন।

যেসব শিক্ষাগুরু ও শিক্ষা-উপদেষ্টা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন: যেসব সাহাবী দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের বেশ কয়েকজনের সাক্ষাত পেয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন-

আনাস ইবন মালিক, আব্দুল্লাহ্ ইবন আবী আওফা, সাহল ইবন সা’দ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তবে তিনি তাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। কারণ সেসময় তার বয়স ছিল কম। তবে আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি বড় বড় তাবেয়ীদের সাক্ষাত পেয়েছেন, তাদের সাথে উঠাবসা করেছেন, ইলমের আদান-প্রদান করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, “আমি ইলম ও ফিকহের সুতিকাগারে ছিলাম। আলেম ও ফকীহদের মজলিসে আমি হাজির হতাম এবং তাদের একজনের ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম।”

এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইলমী পরিবেশে ছিলেন, আলেমদের মজলিসে হাজির হয়েছেন এবং তাদের গবেষণার পদ্ধতিগুলো আয়ত্ব করতে পেরেছেন। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে একজন ফকীহকে বাছাই করে নেন। যার পদ্ধতির সাথে তাঁর ইলমী ঝোঁকপ্রবনতা খাপ খেয়েছিল। তিনি হচ্ছেন ‘হাম্মাদ ইবন আবি সুলাইমান’। যিনি তার সময়কালে ইরাকের ফিকহের পণ্ডিতদের শীর্ষে ছিলেন। সুতরাং তিনি

সুদীর্ঘ আঠারো বছর তার সান্নিধ্যে কাটান। সার্বক্ষনিক সাথী হিসেবে থাকেন।

হাম্মাদ ফিকহশাস্ত্রের অধিকাংশ জ্ঞান গ্রহণ করেন 'ইব্রাহীম নাখায়ী' থেকে। তার ফিকহ ছিল যুক্তিনির্ভর। আবার শা'বীর কাছ থেকেও তিনি ফিকহ গ্রহণ করেন। তার ফিকহ ছিল হাদীস নির্ভর। আর এ দুজন ফিকহের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন দুজন সাহাবীর কাছ থেকে। তারা হলেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ' ও 'আলী ইবন আবী তালেব' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। এ দু'জন সাহাবী কূফাতে বসবাস করেন এবং কূফাবাসীর কাছে ফিকহের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রেখে যান।

এছাড়া আবু হানীফার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, 'আতা ইবন আবী রাবাহ্' । 'আতা' রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জ্ঞানের সার-নির্যাস গ্রহণ করেছেন ইকরিমার কাছ থেকে। ইকরিমা ছিলেন ইবনে আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আযাদকৃত দাস ও তাঁর একান্ত ছাত্র। যখনি আবু হানীফা বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী হতেন তখনি 'আতা ইবন আবী রাবাহ এর সান্নিধ্যে থাকতেন।

আবু হানীফার শিক্ষকদের মধ্যে আরো রয়েছেন- ইবনে উমরের আযাদকৃত দাস 'নাফে'। তার সান্নিধ্যে থেকে আবু হানীফা 'ইবনে উমর' ও 'উমরের' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফিকহের জ্ঞান গ্রহণ করতে পেরেছেন। এভাবে তিনি উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমরের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইলম গ্রহণ করতে পেরেছেন তাদের ছাত্রদের কাছ থেকে। আবু হানীফা শুধু এসব ফকীহদের কাছ থেকে ইলম নিয়ে ক্ষান্ত হননি; বরং রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধরদের কাছ থেকেও ইলম গ্রহণ করেছেন, তাদের কাছে পড়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম যায়েদ ইবন আলী, মুহাম্মদ ইবন বাকের, জাফর সাদেক, আব্দুল্লাহ্ ইবন হাসান ইবন হাসান।

অগ্নি পরীক্ষা ও তাঁর মৃত্যু: আবু হানীফার সময়কালটা ছিল নানান ধারার চিন্তাচেতনা ও ফেতনা-ফাসাদে ভরপুর। বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের সাম্রাজ্যদ্বয়ের শাসনকাল তিনি পেয়েছেন। একবার উমাইয়াদের শাসনাধীন কূফার গভর্নরের পুত্র আবু হানীফার কাছে তলব পাঠাল তার সাথে সহযোগিতা করতে হবে। তখন তিনি তার সাথে সহযোগিতা করতে অসম্মতি জানান। যার ফলে তাকে

কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হয়। পরবর্তীতে তিনি পালিয়ে মক্কায় এসে আশ্রয় নেন এবং ১৩০-১৩৬ হিঃ পর্যন্ত সময়কালে তিনি মক্কাতে অবস্থান করেন। পবিত্র মক্কা ছিল ইবনে আব্বাসের ইলমের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে অবস্থান করে তিনি ইবনে আব্বাসের শিষ্যদের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন।

যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের নেতৃত্বের ভার আব্বাসীদের হাতে আসল তখন তিনি কূফাতে ফিরে যান এবং আব্বাসীদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। কূফায় ফিরে সেখানকার মসজিদে ইলম শিক্ষা দেওয়ার কাজ পুনরায় চালু করেন। আব্বাসীদের সাথে তার মিত্রতা দীর্ঘদিন অটুট ছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ যা মনে হচ্ছে- আলে বাইতের কোনো এক সদস্যের প্রতি অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর উত্তর পুরুষদের কারো একজনের প্রতি খলিফা মনসুরের বিরূপ অবস্থানকে তিনি সমালোচনা করেন। এছাড়াও খলিফার আশেপাশে এমন অনেক লোক ছিল যারা আবু হানীফার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে মনসুরকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করত। যার ফলে খলিফা মনসুর তাঁর ইখলাস পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে কাজীর (বিচারকের) দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। ভুল বিচার করে গুনাহে

লিপ্ত হওয়ার ভয়ে ইমাম এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি মনে করতেন ‘কাজী বা বিচারকের পদের মত একটি স্পর্শকাতর পদের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যোগ্য নন। তাঁর এই অস্বীকৃতির কারণে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সুযোগ পেয়ে মনসুর তাঁকে বন্দী করে তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। তারপর এই শর্তে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় যে, তাকে ফতোয়া দিতে হবে। কিন্তু তিনি কোনো ফতোয়া না দিয়েই মাসয়ালাগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এরপর পুনরায় তাকে জেলে পাঠানো হয়। তারপর আবার জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এবার ফতোয়া দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি বাড়ী থেকে বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মৃত্যু অবধি তিনি এ অবস্থায় ছিলেন। সঠিক বর্ণনা মতে ১৫০ হিজরীতে তিনি মারা যান। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, কারাগারে বিষ পান করিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী তাকে ‘খায়যারান’ এলাকায় দাফন করা হয়। অনুমান করা হয় তাঁর জানাযাতে পঞ্চাশ হাজার লোক শরীক হয়েছিল। তাঁর উচ্চমানের দ্বীনদারী ও আল্লাহ্‌ভীতির স্বীকৃতি দিয়ে

খলিফা মনসুর নিজেই তাঁর জানাযায় শরীক হন। মনসুর তাঁর ব্যাপারে বলেন, “জীবিত বা মৃত কোন সে ব্যক্তি যে আমার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে?”

আল্লাহ্ তায়ালা ইমাম আবু হানীফার প্রতি রহম করুন,

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।

হিজরতের দেশের ইমাম মালেক ইবন আনাস রাহিমাহুল্লাহ[4]

[৯৩-১৭৯ হিঃ]

বংশ পরিচয়: তিনি হচ্ছেন হিজরতের দেশ মদীনার ইমাম, আবু আব্দুল্লাহ্ মালেক ইবন আনাস ইবন মালেক ইবন আবু আমের ইবন আমর ইবন হারেছ ইবন গায়মান ইবন জুছাইল ইবন আমর ইবন আলহারেছ আলআছবাহী।

শৈশবকাল: ইমাম মালেক আলেম-পরিবারে বড় হয়েছেন। তার দাদা মালেক ইবন আবু আমের বয়োজ্যোষ্ঠ তাবেয়ী ছিলেন এবং তাবেয়ীদের মাঝে বড় আলেম ছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর শাসনামলে ‘মুসহাফ’ (কুরআন) লেখার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ও রাষ্ট্রীয় কাজে তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ কাজের জন্য সে যুগের যে সব উল্লেখযোগ্য লোকদেরকে ডাকা হয় ইমাম মালেকের দাদা ‘মালেক’ও তাদের একজন ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ আবু যুহরার “মালেক হায়াতুহু ওয়া আসরুহু: আ-রাউহু ওয়া ফিক্হুহু” এবং ড. আহমাদ ত্বহা রাইয়্যানের “মালামিহ মিন হায়াতি মালেক ইবন আনাস” শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ের সহযোগিতা নিয়ে এই জীবনীটি সাজানো হয়েছে।

ইমাম মালিকের ভাই ‘নদর’ তৎকালীন আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে ইলম শিখতেন। এমনকি ইমাম মালেক যখন ইলমী মজলিসগুলোতে হাজির হওয়া শুরু করেন তখন লোকেরা মালেককে ‘নদরের ভাই’ বলে চিনত। এরপর ইমাম মালেকের ইলমী খ্যাতি যখন আলেমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখন নদরকে ‘ইমাম মালেকের ভাই’ বলা হত।

যে অঞ্চলে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বড় হয়েছেন সার্বিকভাবে সে অঞ্চল ছিল ইলমের জন্য উপযুক্ত, মেধার বিকাশের জন্য উর্বর। যেহেতু তা হচ্ছে মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মদীনা, শরীয়ত নাযিলের পূণ্যভূমি, আলো বিচ্ছুরণের উৎস, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম কেন্দ্রস্থল। প্রথম উমাইয়া শাসনামলে এটি ছিল আলেমদের বিচরণভূমি। এমনকি ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কূফাতে থাকাকালে যখন কোনো মাসয়ালায় ফতোয়া দিতেন এবং মদীনায় এসে এর বিপরীত কোনো মত অবগত হতেন তখন তিনি বাহন থেকে নামার আগে ফতোয়া জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিকে সঠিক মতটি জানিয়ে আসতেন।

এমন একটি মনোরম ইলমী পরিবেশে ইমাম মালেক বড় হয়েছিলেন। শৈশবেই তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। তারপর

হাদীস মুখস্থ করায় মশগুল হন। এরপর আলেমদের মজলিসে যাওয়া-আসা শুরু করেন।

ইলম অর্জন ও তাঁর ইলমী মর্যাদা: ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন ইলম তলবে পরিশ্রমী। পরিপূর্ণ উদ্যম, ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের মাধ্যমে ইলম অর্জনে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। আলেমরা তাদের ঘর থেকে মসজিদে বের হওয়ার সময়ের প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন তিনি। ইমাম মালেক নিজের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন, "তিনি 'ইবনে হুরমুযের' কাছে সাত বছর কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি অন্য কারো কাছে যান নি।" সাত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হুরমুযের সান্নিধ্যে থাকতেন। ইবনে হুরমুয তাঁর মাঝে শুভ লক্ষণ দেখতে পেয়ে তাঁর ব্যাপারে উত্তম ভবিষ্যতের আশাবাদী ছিলেন। একদিন হুরমুয তাঁর দাসীকে বললেন, 'দেখ তো দরজায় কে? দাসী মালেক ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না। এসে বলল, সেখানে ঐ গৌরবর্ণের ফর্সা লোকটি। হুরমুয বললেন, তাকে ডেকে আন; সে মানুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলেম।'

বিশ্রামের সময়ও যদি ইলম তলবের কোনো সুযোগ থাকত মালেক রাহিমাহুল্লাহ সে সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। মালেক রাহিমাহুল্লাহ

বলেন, “একবার ঈদের দিনে আমি ভাবলাম আজ ‘ইবনে শিহাব’ নিরিবিলি থাকবেন। এই ভেবে আমি ঈদগাহ থেকে সোজা তার বাসার দরজায় গিয়ে বসে থাকলাম। আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তিনি তাঁর দাসীকে বলছেন, দেখ তো দরজায় কে? দাসী বলল, ঐ তো সে মালেক নামের ফর্সা লোকটি। তিনি বললেন, তাকে ঘরে আসতে দাও। আমি ঘরে ঢুকলাম। আমাকে বললেন, তুমি বাসায় যাওনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কিছু খেয়েছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কিছু খাবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে কি চাও? আমি বললাম, আমাকে কি হাদীস শুনাবেন? তিনি বললেন, ঠিক আছে বস। আমি আমার হাদীসের নোট বই বের করলাম। তখন তিনি আমাকে চল্লিশটি হাদীস শুনালেন। আমি বললাম, আরো শুনান। তিনি বললেন, এটাই যথেষ্ট। তিনি বললেন, যদি তুমি এই হাদীসগুলো (মুখস্থ) শুনাতে পার তাহলে তুমি ‘হাদীসের হাফেয’। আমি বললাম, আমি শুনাতে পারব। তিনি তখন আমার হাত থেকে খাতাগুলো নিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, শুনাও দেখি। আমি তাকে শুনালাম। এরপর আমাকে খাতাগুলো দিয়ে বললেন, “উঠে যাও। তুমি ইলমের ভাণ্ডার।”

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে উমরের আযাদকৃত দাস নাফে’র কাছ থেকেও প্রচুর ইলম শিখতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক বলেন, “ঠিক দ্বিপ্রহরে আমি তার কাছে আসতাম। সূর্যের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য কোনো গাছের ছায়া পেতাম না। তাঁর বের হওয়ার প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম। যখন তিনি বের হতেন তখন কিছু সময় আমি অপেক্ষা করতাম, যেন আমি তাকে দেখতে পাইনি। একটু পর গিয়ে সালাম দিয়ে তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। এমনকি তিনি পুনরায় ঘরে ঢুকার আগ পর্যন্ত আমি বলতে থাকতাম ‘ইবনে উমর’ অমুক বিষয়ে কি বলতেন, অমুক মাসয়ালায় কি বলতেন। আর তিনি আমাকে উত্তর দিতেই থাকতেন।

এভাবে ইলম অর্জনের পথে জানমালের সর্বোচ্চ কুরবানী দিতে তিনি সামান্যতম কার্পণ্য করেন নি। তাঁর ছাত্র ‘ইবনে কাসেম’ তাঁর ব্যাপারে বলেন, ইলমের পথে ত্যাগ করতে করতে ইমাম মালেক ফতুর হয়ে পড়েছিলেন। তার ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়েছিল। তখন তিনি ছাদের কাঠগুলো খুলে বিক্রি করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বৈষয়িক সমৃদ্ধি পেয়েছেন।

যখন ইমাম মালেকের চিন্তা পরিপক্কতা পেল এবং তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করল তখন তিনি মসজিদে নববীতে পাঠদান ও ফতোয়া দেওয়ার ব্রতে মশগুল হন। তার ওস্তাদদের কাছ থেকে তার ইলমী যোগ্যতার সত্যায়ন ও স্বীকৃতি পাওয়ার পর তিনি উক্ত ব্রতে মশগুল হন। তিনি বলেন, "হাদীসের পাঠদান ও ফতোয়া দেওয়ার জন্য আমি যোগ্য - আমার সত্তরজন ওস্তাদ এই সাক্ষ্য দেওয়ার পর আমি পাঠদান ও ফতোয়া দেওয়া শুরু করি। যারা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও রাবীয়া'র মত ব্যক্তিবর্গও ছিলেন।" তিনি এই কথাটি সবসময় বলতেন, "যে ব্যক্তি নিজের জন্য এমন কোনো পদ দাবী করে, যে পদের জন্য মানুষ তাকে যোগ্য মনে করে না সে ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নাই ।"

তাঁকে যদি কোনো মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হত, যা তার অজানা, তিনি সাফ বলে দিতেন, "আমি জানি না।" তিনি তাঁর ওস্তাদ হুরমুয থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তিনি হুরমুয থেকে বর্ণনা করে বলেন, "আমি হুরমুযকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আলেমের উচিত তাঁর শিষ্যদেরকে "আমি জানি না" এ কথা বলা শিক্ষা দিয়ে যাওয়া। যেন এই বাক্যটি তাদের হাতে একটি হাতিয়ার

হিসেবে থাকে। যখন তাদের কেউ কোনো প্রশ্ন শুনে কি উত্তর দিবে ভেবে না পায় তখন সে যেন বলে, “আমি জানি না”

ইমাম মালেক আলেম সমাজের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা বলেন, “কোন প্রশ্নের তড়িৎ জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং সমালোচনামূলক আলোচনায় আমি ইমাম মালেকের তুল্য কাউকে দেখিনি।”

আবু ইউসুফ তাঁর ইলমী মর্যাদার সত্যায়ন করতে গিয়ে বলেন: “তিন ব্যক্তির চেয়ে অধিক ইলমধারী আমি আর কাউকে দেখিনি। তারা হচ্ছেন- মালেক, ইবনে আবি লাইলা, আবু হানীফা।” শেষ দুজন ছিলেন আবু ইউসুফের ওস্তাদ, তাই মালেককে তিনি তাঁদের পর্যায়ে স্থান দেন।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ব্যাপারে তাঁর ছাত্র ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “তাবেয়ীদের পর ইমাম মালেক ছিলেন মাখলুকাতের উপর আল্লাহ্ তা‘আলার সাক্ষী। মালেক হচ্ছেন আমার ওস্তাদ, আমি তাঁর কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছি। তিনি আমার শিক্ষক। আমার উপর অন্য কারো চেয়ে মালেকের অবদান অনেক

বেশী। তাঁকে আমি আমার মাঝে ও আল্লাহ্‌র মাঝে হুজ্জত মনে করি।”

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “মালেক হচ্ছেন শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। তিনি হাদীসের ক্ষেত্রেও ইমাম, ফিকহের ক্ষেত্রেও ইমাম। মালেকের তুল্য আর কে আছে? যিনি পরিপূর্ণ বোধ ও আদবের সাথে পূর্ববর্তীদের আদর্শের অনুসারী ছিলেন।”

হাদীসে এসেছে- “ইলমের সন্ধানে মানুষ দেশ-দেশান্তরে সফর করবে। কিন্তু তারা মদীনার আলেমের চেয়ে অধিক ইলমধারী আর কাউকে পাবে না।”[5] তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মতে এই হাদীসটিতে ইমাম মালেককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কঠিন পরীক্ষা: আব্বাসী যুগে খলিফা মনসুরের সময় ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তৎকালীন সময়ে মদীনার গর্ভনর ছিল খলিফা মনসুরের চাচাতো ভাই। সে ইমাম মালেকের

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তিরমিযী তার জামে’ গ্রন্থে (নং ২৬৮০) হাদীসটি সংকলন করেছেন।

গায়ে হাত তোলে। কারণ পরশ্রীকাতর কিছু ব্যক্তি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর বিরুদ্ধে একটা অপপ্রচার রটিয়ে দেয়। তারা বলে, "ইমাম মালেক ফতোয়া দিচ্ছেন যে, 'চাপের মুখে যে ব্যক্তি কোনো স্বীকৃতি দেয় তার কাছ থেকে কসম তলব করা যাবে না।' এ কথার অর্থ হচ্ছে- আপনারা জোরপূর্বক যাদের কাছ থেকে বায়'আত (শাসক হিসেবে স্বীকৃতি) গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক তাঁর এ ফতোয়ার মাধ্যমে সে বায়'আতকে ভঙ্গের কথা বলছে।" তখন গভর্নরের নির্দেশে তাঁকে ধরে আনা হয় এবং সত্তরটি বেত্রাঘাত করা হয়। যার ফলে তিনি কাতর হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর প্রতি মুসলিমদের অন্তরে ছিল অগাধ সম্মান। তাই এ ঘটনার পর পুরো মদীনার অলি-গলি থরথর করে কেঁপে উঠে। মানুষ তীব্র প্রতিবাদে ও বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। তখন খলিফা হেজাযবাসীদের অভ্যুত্থানের ভয়ে ইমাম মালেককে ইরাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। অবশেষে খলিফা হজ্জের সময় মিনাতে তার সাথে দেখা করার কথা বলে পাঠান। যখন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ খলিফার সাক্ষাতে প্রবেশ করেন তখন মনসুর তার আসন থেকে নীচে নেমে বসেন এবং

মালেককে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে একবারে তার কাছে নিয়ে বসান। এরপর তাঁকে প্রহার করা ও কষ্ট দেওয়ার কারণে দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, ‘আবু আব্দুল্লাহ্ (মালেকের উপনাম), সেই আল্লাহ্র শপথ যিনি ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নাই- এই নির্দেশ আমি দেইনি। এমনকি ঘটনাটা ঘটার আগ পর্যন্ত আমি জানতাম না এবং জানার পর আমি তা মেনে নিতে পারিনি। আবু আব্দুল্লাহ্, আপনি যতদিন হেজাযে আছেন ততদিন হেজাযবাসী কল্যাণে থাকবে। আমি মনে করি আল্লাহ্র শাস্তি থেকে নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য আপনিই তাদের সহায়। আল্লাহ্ তা‘আলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে বড় এক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি ফরমান জারি করেছি গভর্নর জাফরকে যেন মদীনা থেকে খাটে করে আনা হয় এবং একটি সংকীর্ণ স্থানে বন্দী করে রেখে চরম অপমান করা হয়। সে আপনার সাথে যতটুকু বেয়াদবি করেছে আমি তাকে এর চেয়েও বেশী শাস্তি দিব।

ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, “হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ্ তাকে মাফ করুন এবং তার সম্মান বৃদ্ধি করুন। আল্লাহ্র রাসূলের

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুটুম হওয়ার কারণে এবং আপনার সাথে তার আত্মীয়তা থাকার কারণে আমি তাকে মাফ করে দিলাম।"

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী: সাহাবীদের যুগের মুজতাহিদ আলেমগণ তাদের ফতোয়া লিপিবদ্ধ করতে বাধা দিতেন। যেন ইসলামের মূলনীতির উপর লিপিবদ্ধ বই একটিই থাকে- 'কুরআন'। এরপর আলেমরা সুন্নাহ্ সংকলন করা এবং ফতোয়া ও ফিকহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু তখনও এই জ্ঞানগুলো গ্রন্থের রূপ লাভ করেনি, বরং অনেকটা ব্যক্তিগত নোটবুকের আকারে ছিল। ইমাম মালেকের "মুয়াত্তা"- ই ইসলামী জ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

তিনি এ বইয়ের মধ্যে সহীহ হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীদের বাণী, তাদের ফতোয়া এবং তাঁর নিজস্ব মতামত উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের সংকলন সমাপ্ত করতে তাঁর চল্লিশ বছর সময় লেগেছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি এ গ্রন্থটি সংকলন করতে কতটুকু পরিশ্রম করেছেন। এই কিতাবের সুনাম কুড়ানোর জন্য এইটুকু যথেষ্ট যে, ইমাম শাফেয়ী এই গ্রন্থের ব্যাপারে বলেন, "পৃথিবীর বুকে 'মুয়াত্তার' চেয়ে বিশুদ্ধ কোনো ইলমী কিতাব নেই।" ইমাম নাসায়ী

বলেন, "আমার দৃষ্টিতে তাবেয়ীদের পর ইমাম মালেকের চেয়ে উত্তম, উৎকৃষ্ট, নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসের ব্যাপারে বিশ্বস্ত আর কোনো ব্যক্তি নেই। দুর্বল রাবীদের কাছ থেকে তার বর্ণনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।"

তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যু: ইমাম মালেক বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। যার ফলে তার দরসের মজলিস (শিক্ষা মজলিস) মসজিদে নববী থেকে তাঁর ঘরে স্থানান্তরিত করেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি ইলম তলব, হাদীস গ্রহণ, পাঠদান ও ফতোয়া দেওয়ার মহানব্রতে রত থাকেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে তিনি দীর্ঘ ২২দিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার পর ১৪ই রবিউল আউয়াল ১৭৯ হিজরীতে মারা যান। তিনি তাঁর রোগের ব্যাপারে এবং মসজিদে নববী থেকে তার দরস সরিয়ে নেয়ার কারণ সম্পর্কে তার মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কাউকে কিছু জানাননি। মৃত্যুর দিন তার দর্শনার্থীদেরকে বলেন, "হয়ত এটা আমার শেষ দিন। তাই আপনাদেরকে আমার বহুমূত্র রোগের কথা জানালাম। আমি অজু ছাড়া মসজিদে নববীতে আসাটা অপছন্দ করতাম এবং আমি আমার রোগের কথা জানানোটাও অপছন্দ করেছিলাম। বরং আমার রব্বের

কাছেই অভিযোগ করতাম। আল্লাহ্ তা‘আলা ইমাম মালেকের প্রতি রহম করুন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তার ব্যাপারে ইবনে উয়ায়না যা বলেছেন বাস্তবে তিনি তাই ছিলেন। তিনি বলেছেন, “মালেক হচ্ছে এ উম্মতের প্রদীপ।”

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ[6]

[১৫০হিঃ-২০৪হিঃ]

বংশ পরিচয়: তিনি হচ্ছেন আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন ইদ্রিস ইবন আল-আব্বাস ইবন ওসমান ইবন শাফে' ইবন আস-সায়েব ইবন উবাইদ ইবন আবদ ইয়াযীদ ইবন হাশেম ইবন আল-মুত্তালিব ইবন আবদে মানাফ। এই আবদে মানাফ হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরদাদা। আর শাফে' রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী ছিলেন। শাফে'র পিতা আস-সায়েব বদরের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মাতা ছিলেন ইয়েমেনের আয্দ কবিলার মেয়ে। জন্মগতভাবে এ মহিলা অনেক বুদ্ধিমতি ছিলেন।

জন্ম ও শৈশব: যে বছর ইমাম আবু হানীফা মারা যান সে বছর অর্থাৎ হিজরী ১৫০ সালে ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে ইমাম শাফেয়ী জন্মগ্রহণ করেন। গাজা তার পিতৃভূমি ছিল না। বরং তার পিতা

মুহাম্মদ আবু যুহরার "আশ শাফেয়ী" এবং "হাশিয়াতুল বুজাইরামী" শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ের সহযোগিতা নিয়ে জীবনীটি লেখা হয়েছে।

ইদ্রিস একটা বিশেষ প্রয়োজনে সপরিবারে গাজায় যান। সেখানেই তার ছেলে মুহাম্মদের জন্ম হয় এবং তিনি মারা যান। ইমাম শাফেয়ীর বাবা যখন মারা যান তখন তিনি দুই বছরের শিশু। তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার মা তাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। তিনি ইয়েমেনে নিজ কবিলা 'আয্দের' কাছে না গিয়ে ছেলেকে নিয়ে মক্কায় যাওয়াটা শ্রেয় মনে করেন। যেন ছেলের বংশ পরিচয় বিস্মৃত না হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগারে রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়দের জন্য যে অংশ বরাদ্দ থাকে তা থেকেও যেন তার ছেলে বঞ্চিত না হয়। এটাই ছিল এই শিশুর জীবনে প্রথম সফর যার পুরো জীবনটা ইলমী সফরে কাটে।

ইমাম শাফেয়ী মক্কাতে বড় হয়েছেন। উচ্চ বংশীয় মর্যাদা নিয়ে তিনি বেড়ে উঠেছেন। কিন্তু তাকে জীবন যাপন করতে হয়েছে এতীম ও গরীবদের মত। সম্ভ্রান্ত বংশের যে শিশু গরীবি হালতে জীবন যাপন করে বড় হয় তার মাঝে উন্নত চরিত্র ও উত্তম আখলাক শোভা পায়। বংশ ভাল হওয়ার কারণে তার মানসিকতা থাকে অনেক বড়। আর গরীব হওয়ার কারণে সে মানুষের দুখ-দুর্দশা, সমাজের ভেতরের

অবস্থা নিজে অনুভব করতে পারে। যে ব্যক্তি সামাজিক কোনো কাজে ভূমিকা রাখতে চায় তার জন্য এ গুণটি অত্যন্ত জরুরী।

ইলম অর্জন ও ইলমী মর্যাদা: সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। মক্কার বড় ক্বারী ঈসমাইল ইবন কুসতানতিনের কাছে তিনি তাজবীদ শিক্ষা করেন। মক্কার আলেমদের কাছে তিনি তাফসীরের ইলম অর্জন করেন। যারা 'কুরআনের ভাষ্যকার[7] ও কুরআনের মুফাস্সির' আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইলমের ওয়ারিস ছিলেন। কুরআন মুখস্থ করার পর তিনি হাদীস মুখস্থ করায় মনোযোগী হন।

ছেলেবেলা থেকে তিনি আরবী ভাষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন। আরবী ব্যাকরণ, সাহিত্য, কবিতা ও ভাষাশৈলী আয়ত্ব করার জন্য তিনি বেদুঈন পল্লীতে চলে যান। দীর্ঘ দশ বছর হুযাইল কবিলাতে অবস্থান করে তিনি তাদের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গি এবং শিল্প-সাহিত্য আয়ত্ব করেন। হুযাইল গোত্র ছিল আরবদের মাঝে সবচেয়ে

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর উপাধি।

বিশুদ্ধভাষী কবিলা। যার ফলে ইমাম শাফেয়ী অল্প বয়সে আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।

বিখ্যাত আরব্য সাহিত্যিক আসমায়ী' বলেন, "আমি হুযাইল গোত্রের কবিতামালার ভুলগুলো শুধরে নিয়েছি কুরাইশদের এক বালকের কাছে। তার নাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস।" ইমাম শাফেয়ী মক্কার মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াতেন, আর মনোযোগ দিয়ে আলেমদের দরস (লেকচার) শুনতেন। খুব সংকটের মাঝে তিনি জীবন ধারণ করতেন। লেখার জন্য কাগজ কেনার পয়সা মিলতো না। তাই তিনি হাড্ডি, চীনামাটির পাত্র, সমান্তরাল যে কোনো কিছু সংগ্রহ করে সেগুলোর উপর লিখতেন। তিনি বলতেন, "অভাবের মাঝে যে ইল্‌ম তলব করে নাই সে ইল্‌ম অর্জনে সফল হবে না। আমি লেখার জন্য খাতা কেনার পয়সা পেতাম না।"

সে যুগের আলেম-ওলামা, ফিকহবিদরা মদীনার উদ্দেশ্যে সফর করত মদীনার প্রসিদ্ধ আলেম মালেক ইবন আনাসকে দেখার জন্য। মসজিদে নববীতে ইমাম মালেকের দরসের মজলিস ছিল। খলিফারাও সে মজলিসের কদর করতেন। ইমাম শাফেয়ীর কানেও ইমাম মালেকের খবর পৌঁছে। তিনি ইমাম মালেককে দেখার জন্য,

তার ইলমের বাণী শুনার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়েন। এ উদ্দেশ্যে তিনি মালেকের মুয়াত্তা গ্রন্থ মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে সফর করেন। অনেক কষ্ট-ক্লেশের পর তিনি ইমাম মালেকের দরজায় পৌঁছতে সক্ষম হন। ইমাম মালেকের ফারাসা (অর্ন্তদৃষ্টি) ছিল। তিনি শাফেয়ীর দিকে একনজর তাকিয়ে বলেন, "মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ থেকে বেঁচে থাক। অচিরেই তোমার মহান মর্যাদা হবে।" অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, "আল্লাহ্ তোমার অন্তরে একটা নূর ঢেলে দিয়েছেন। গুনায় লিপ্ত হয়ে এ নূরকে নিভিয়ে ফেলো না।" এরপর বললেন, "আগামীকাল আস। যে ছাত্র কিতাব পড়বে এবং তুমি শুনবে সেও আগামীকাল আসবে।" শাফেয়ী বললেন, "আমি নিজেই পড়ব। এরপর আমি পুরা মুয়াত্তা মালেককে মুখস্থ শুনিয়েছি, কিতাব আমার হাতে ছিল। আমার পড়ার ধরন এবং ব্যাকরণিক নির্ভুলতা দেখে মালেক বেশ অভিভূত হন। মালেক বিরক্ত হন কিনা - এই ভয়ে যখনি আমি পড়া বন্ধ করতে চাইতাম তিনি বলতেন, এই ছেলে আরো পড়। তাই অতি অল্প দিনে সম্পূর্ণ মুয়াত্তা আমি তাকে পড়ে শুনিয়েছি। তিনি বলতেন, যদি কেউ সফলকাম হওয়ার থাকে,

তাহলে সে হল এই ছেলেটি।” মুয়াত্তা পড়া শেষ করার পর তিনি মালেকের কাছে উক্ত কিতাবের আলোকে ফিকহ শিখতে থাকেন এবং মালেক রাহিমাহুল্লাহ যেসব মাসয়ালায় ফতোয়া দিতেন সেগুলো বুঝতে থাকেন। ওস্তাদ ও ছাত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। মালেক রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, “আমার কাছে এই ছেলের চেয়ে অধিক সমঝদার কোনো কুরাইশী ছেলে আসেনি।” আর শাফেয়ী বলতেন, “যদি আলেমদের কথা বলতে হয় তবে মালেক হচ্ছেন নক্ষত্রতুল্য। মালেক আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহ করেছেন।”

তার ইবাদত বন্দেগী ও আখলাক: তিনি ছিলেন অত্যধিক ইবাদতগুজার। রাত্রিকে তিনি তিনভাগে ভাগ করতেন। একভাগ ইল্‌মের জন্য, একভাগ ঘুমের জন্য, আর একভাগ ইবাদতের জন্য। তিনি তার রবের সামনে নামাযে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করতে থাকতেন; আর আমলে কসুরের ভয়ে তার চক্ষু অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে থাকত।” অতি বিনয়ের কারণে তিনি নিজেকে পাপী মনে করতেন। তিনি বলতেন,

“আমি সালেহীনদের (পূন্যবানদের) ভালবাসি; কিন্তু আমি পূন্যবান নই। এ আশায় যে আমি তাদের শাফায়াত পাব।

আমি তাদেরকে অপছন্দ করি যাদের সম্বল হল পাপ; যদিও সম্বলের দিক থেকে আমি এবং ওরা পরস্পর সমান।"

যিনি নিজের ব্যাপারে এই কথা বলেছেন লোকেরা তার ব্যাপারে বলেছে, "পূণ্যের পথ থেকে বিচ্যুতির সামান্যতম মোহ তার ব্যাপারে জানা যায়নি।"

আল্লাহ্ এই মহান আলেমকে তার খাস অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। এ কারণে তার কথার দারুন প্রভাব ছিল। তার কথা বের হত আলোকিত অন্তর থেকে। তাছাড়া নিরবিচ্ছন্ন ইবাদত ও আল্লাহ্র প্রতি তীব্র ভালোবাসা তার কথার প্রভাব ও আকর্ষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করেছিল। কুরআনের প্রতি ও এর সুহবতের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরক্ত। প্রতিদিন তিনি এক খতম কুরআন শরীফ পড়তেন। আর রমযানে দিনে এক খতম এবং রাতে এক খতম পড়তেন। যখন তিনি কুরআন পড়তেন তখন নিজেও কাঁদতেন এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতেন। তাঁর সময়কার জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আমরা যখন কাঁদতে চাইতাম তখন একে অপরকে বলতাম: চল আমরা মুত্তালিবের বংশধর ঐ ছেলেটার কাছে গিয়ে কুরআন পড়ি। যখন আমরা তার কাছে আসতাম সে কুরআন পড়া শুরু করত।

পড়ার এক পর্যায়ে মানুষ তার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত এবং কান্নার রোল পড়ে যেত। যখন সে এ অবস্থা দেখত তখন পড়া বন্ধ করে দিত।”

শরীয়তের বিধানের উপর তিনি এক পায়ে খাড়া থাকতেন। তিনি ছিলেন মহানুভব, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, যেমনটি হয়ে থাকে রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধররা। তেমনি ছিলেন দানশীল। গরীব-মিসকীনকে এত অঢেল দান করতেন যেন তিনি অভাবকে কোনো তোয়াক্কা করতেন না। তার দানের ব্যাপারে অনেক বিস্ময়কর সব বর্ণনা রয়েছে।

তিনি বলতেন, “মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্তম্ভ চারটি। সৎচরিত্র, দানশীলতা, বিনয় এবং ইবাদত-বন্দেগী।” লাজুকতা ছিল তার বিশেষত্ব। এমনকি তার ব্যাপারে বলা হয় যে, যদি তার কাছে এমন কিছু চাওয়া হত যা তার কাছে নেই তখন লজ্জায় তার চেহারা লাল হয়ে যেত।

অগ্নি পরীক্ষা: ইমাম শাফেয়ীর বিরুদ্ধে শিয়ামতবাদের প্রতি অনুরক্ততার অভিযোগ তোলা হয়। খলিফা হারুন-অর-রশীদের

দরবারে তাকে চক্রান্তকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। ফলে হারুন-অর-রশীদ তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি ফরোয়ানা জারি করেন। আদেশ মতে তাকে এবং আরো নয়জন আলাওয়ীকে রশীদের কাছে ধরে আনা হয়। তখন তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। শাফেয়ীর সামনে আলাওয়ীদের নয়জনকে একের পর এক হত্যা করা হয়। এরপর আসে তার পালা। বিচারক 'মুহাম্মদ ইবন হাসান' হারুনের সামনে উপস্থিত ছিলেন। শাফেয়ী তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা দিয়ে খলিফার বিবেক ও মন ঝোঁকাতে পেরেছেন এবং তার নির্দোষত্ব তুলে ধরতে পেরেছেন। তখন খলিফা তাকে বিচারক মুহাম্মদ ইবন হাসানের কাছে সোপর্দ করেন। আলেমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হওয়াই স্বাভাবিক। বিচারক তার পক্ষে কথা বলেন এবং খালাস পেতে সহযোগিতা করেন। বিচারক বলেন, "তার ইলমী মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তার ব্যাপারে যে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয়।" এভাবে তিনি অভিযোগ থেকে মুক্তি পান। উপরন্তু খলিফা তার জন্য পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা উপঢৌকন হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। শাফেয়ী খলিফার কাছ থেকে এ উপঢৌকন গ্রহণ করে আবার তার সদর দরজাতেই তা বিতরণ করে দেন।

অসুস্থতা ও মৃত্যু: শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ অনেক রোগ-ব্যাধিতে ভুগতেন। বিশেষত অর্শ্বরোগে। তার শেষ জীবনে এ রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি কোনো বাহনে চড়লে হয়তো পরক্ষণেই রক্তপাত শুরু হত। তার বসার বিছানার উপর একটা মোটা নরম কাপড়ের পট্টি থাকত। রক্ত পড়লে এ কাপড়টি চুষে নিত। তিনি রোগ নিয়ে যে কষ্ট করেছেন এমন কষ্ট আর কেউ করেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু রোগব্যাধি তাকে পাঠদান, গবেষণাকর্ম ও পড়াশুনা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তার মত মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটি অবাস্তব কিছু নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- কোন লোকেরা সবচেয়ে বেশী বিপদাপদের মুখোমুখি হোন? তিনি বলেন, "নবীরা, তারপর তাদের নিকটবর্তী মর্যাদার অধিকারীরা, তারপর তাদের নিকটবর্তী মর্যাদার অধিকারীরা"[৪] তার মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তার ছাত্র মুযানি তার সাথে দেখা করতে যান। তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন আজ সকালে আপনার কেমন লাগছে? তখন তিনি বলেন, "আজ আমি দুনিয়াকে

ইমাম তিরমিজী তার জামে' গ্রন্থে সাদ ইবন আবি ওক্কাস (রাঃ) এর সূত্রে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হা. নং (২৩৯৮)

বিদায় জানাচ্ছি, বন্ধুবান্ধবকে ছেড়ে যাচ্ছি, মৃত্যুর সুধা পান করছি, আল্লাহ্‌র পানে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি না আমার রূহ কি জান্নাতের পথযাত্রী, যার ফলে আমি তাকে অভিবাদন জানাব; নাকি জাহান্নামের পথযাত্রী যার ফলে আমি তার জন্য শোক করব। এরপর কেঁদে দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বলেন-

"আমার আত্মা কঠিন হয়ে পড়ল, সব রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে এল। এখন আপনার ক্ষমা আমার জন্য আশার সোপান।

আমার গুনাহ্ অনেক বেশী, অনেক বড়; কিন্তু যখন আমি আমার গুনাহকে আপনার ক্ষমার সাথে তুলনা করি তখন দেখি আপনার ক্ষমাই বড়।

আপনি তো ক্ষমা করে যাচ্ছেন, উদারতা দেখিয়ে যাচ্ছেন; ক্ষমা করাটা আপনার একান্ত অনুগ্রহ, নিরেট অনুকম্পা।"

২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ রাত্রে চুয়ান্ন বছর বয়সে তার রূহ তার রবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

এর পরের দিন আসরের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহকে মিসরের “কারাফা” নামক স্থানে তার অন্তিম শয্যার দিকে বহন করে নিয়ে যায়। শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহর মৃত্যুতে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। আলেমদের চেহারায় শোকের কালিমা ফুটে উঠে। তার ছাত্রদের ডানা ভেঙ্গে যায়। আমাদের উজ্জ্বল ইতিহাসের একটি পাতা ঝরে পড়ে। মানবাকাশে যে উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হয়ে পূর্বপশ্চিম দিগন্ত আলোকিত করেছিল তা অস্তমিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা‘আলা শাফেয়ীর প্রতি রহম করুন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তার অন্তিম শয্যা উত্তম করুন। তার ব্যাপারে ইমাম আহমদ যে মন্তব্য করেছেন তিনি বাস্তবে তেমনি ছিলেন। ইমাম আহমদ বলেন, “শাফেয়ী ছিলেন দুনিয়ার জন্য সূর্য যেমন, দেহের জন্য সুস্থতা যেমন। দেখ এ দুটির কোনো উত্তরসূরী আছে কি অথবা এ দুটির কোনো বিকল্প আছে কি?”

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ[9]

[১৬৪হিঃ- ২৪১হিঃ]

বংশ পরিচয়: তিনি আবু আব্দুল্লাহ্ আহমাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন হাম্বল ইবন হিলাল আশশায়বানী আযযুহলী। তিনি বাবা-মা উভয়ের দিক থেকে শায়বানী কবিলার ছেলে। তার মা হচ্ছেন- সাফিয়্যা বিনতে মায়মুনা বিনতে আব্দুল মালিক আশশায়বানী (শায়বানী হচ্ছে বনু আমেরের শাখা কবিলা)।

ইমাম আহমাদ খাঁটি আরব কবিলাতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার বংশধারায় কোনো অনারবের অনুপ্রবেশ ঘটেনি কিংবা মিশ্রণও ঘটেনি। নাযার ইবন মা'আদ ইবন আদনানের সাথে গিয়ে তার বংশধারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তার ঐতিহ্যবাহী পরিবার থেকে আত্মসম্মানবোধ, সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, সুদৃঢ় ও মজবুত ঈমান ইত্যাদি

---

[9] মুহাম্মদ আবু যুহরার "আহমাদ ইবন হাম্বল" শীর্ষক গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়ে জীবনীটি লেখা হয়েছে।

মহান গুণাবলীর দীক্ষা পান। তিনি বেড়ে উঠার সাথে সাথে তার মাঝে এসব গুণাবলীও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যখন তিনি নানা সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তখন এসব গুণাবলী তার চরিত্রে অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠে।

জন্ম ও শৈশব: ১৬৪ হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসে ইমাম আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। তার মা তাকে পেটে করে 'মার্ভ'[10] থেকে বাগদাদে আসেন। তার জন্ম হয় বাগদাদে। অল্প বয়সে তার বাবা মারা যান। তখন তার মা তার বাবার পরিবারে থেকেই তাকে লালনপালন করেন। বাগদাদে তার বাবার বসবাসের জন্য একখণ্ড জমি ছিল। আর অন্য একখণ্ড জমি থেকে সামান্য কিছু ফসল আসত। কিন্তু তা দিয়ে সংসারের খরচ ঠিকমত চলত না। এ কারণে ধৈর্য্য, সংযম ও অল্পেতুষ্টির মাঝে ইমাম আহমাদ বড় হন।

ইলম অর্জন ও তার ইলমী মর্যাদা: পরিবারের পক্ষ থেকে স্পৃহা পেয়ে ইমাম আহমাদ ইলমের পথে পা বাড়ান। পারিবারিক এ নির্দেশনার সাথে তার ব্যক্তিগত ঝোঁকপ্রবনতা খাপ খেয়ে যায়। সে

মার্ভ হচ্ছে- পারস্যের একটি শহরের নাম। - অনুবাদক।

সময় বাগদাদ ছিল ইসলামী বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। ইমাম আহমাদ তার শিক্ষা জীবনের শুরু থেকে হাদীস বিশারদদেরকে এবং তাদের পথকে পছন্দ করেন। তাই সূচনাতেই তিনি তাদের সান্নিধ্যে আসেন। তবে সম্ভবত তিনি মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্যে আসার আগে ফিকহবিদদের পথ ধরে কিছু দূর এগিয়েছিলেন। যাদের পথ ছিল হাদীস ও কিয়াসের সমন্বিত পথ। বর্ণিত আছে তার ইলমের পথে হাতেখড়ি হয় কাযী[11] আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহর কাছে। যিনি আবু হানীফার ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, “আমি সর্বপ্রথম যার কাছ থেকে হাদীস লিখেছি তিনি হচ্ছেন আবু ইউসুফ।” কিন্তু এরপর তিনি একান্তভাবে মুহাদ্দিসদের পথে অগ্রসর হন। যারা শুধুমাত্র হাদীসের জন্য বিসর্জিত ছিলেন। হিজরী ১৭৯ থেকে ১৮৬ পর্যন্ত তিনি বাগদাদে থেকে হাদীসের জ্ঞান তলব করেন। বাগদাদের বড় মুহাদ্দিস হুশাইম ইবন বাশির ইবন আবু হাযেম আলওয়াসেতির (মৃঃ ১৮৩হিঃ) সান্নিধ্যে তিনি দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত করেন। এ সময় তার বয়স ছিল প্রায় ১৬ বছর। ইমাম আহমাদ তার কাছ থেকে হজ্জ

আরবী ভাষায় বিচারককে কাযী বলা হয়। - অনুবাদক।

অধ্যায়, তাফসীর অধ্যায়ের কিছু অংশ, বিচার অধ্যায় এবং ছোট ছোট আরো কিছু অধ্যায় লিপিবদ্ধ করেন।

তার গুণাবলী: ইমাম আহমাদের এমন কিছু গুণ ছিল যে গুণগুলো তার এ প্রসিদ্ধির মূল কারণ এবং তার এ বিশাল জ্ঞানের মূল হেতু।

প্রথম গুণ হল- তীক্ষ্ম ও মজবুত স্মৃতিশক্তি। সাধারণভাবে সকল মুহাদ্দিসদের মধ্যে এ গুণ বিদ্যমান থাকে। বিশেষতঃ মুহাদ্দিসদের মধ্যে যারা ইমাম তারা এ গুণের অধিকারী। তার সমকালীন আলেমসমাজ তার তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির সাক্ষ্য দিয়েছেন। বরং তাকে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম স্মৃতিশক্তির অধিকারী মনে করা হত।

দ্বিতীয় গুণ: এটি ইমাম আহমাদের উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর একটি। যে গুণের কারণে তার সুনাম সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলো- ধৈর্য্য, দৃঢ়তা এবং কষ্টসহিষ্ণুতা। এগুলো অতি মহান গুণাবলী। এ গুণাবলীর ভিত্তি হচ্ছে ইচ্ছার দৃঢ়তা, সিদ্ধান্তের অটলতা ও মজবুত মনোবলের উপর। এসব গুণাবলীর কারণে তিনি ইলমের পথে এত কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন। অল্প ইলম নিয়ে তুষ্ট হন নি।

তৃতীয় গুণ: ইমাম আহমাদের অন্যতম আরেকটি গুণ ছিল আত্মসম্মানবোধ। আত্মসম্মানবোধের কারণে তিনি কিছু কিছু হালাল জিনিস থেকেও বিরত থাকতেন। তিনি খলিফাদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন না। কিন্তু তিনি তার কোনো এক ছেলেকে বলেছেন, তা গ্রহণ করা হালাল এবং সে অর্থ দ্বারা হজ্জ করাও জায়েয হবে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতেন না আত্মমর্যাদার কারণে; হারাম মনে করে নয়। নিজের উপর এই সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে গিয়ে তিনি নিজের হাতের কামাই অথবা পৈতৃক জমিতে উৎপাদিত ফসল ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। আর তা করতে গিয়ে তাকে অনেক কষ্ট সইতে হত, আরাম-আয়েশের জীবন থেকে বঞ্চিত হতে হত। তাই তিনি ছিলেন দুনিয়াবিরাগ। আরাম-আয়েশের জীবনের প্রতি তার অবজ্ঞা ছিল ব্যাপারটি এমন নয়, বরং হালাল তালাশ করতে গিয়ে তিনি বিরাগী হয়েছেন। যেহেতু তিনি সন্দেহপূর্ণ সম্পদের মধ্যে হালাল তালাশ করতে যেতেন না। বরং তিনি হালাল তালাশ করতেন এমন সম্পদ থেকে যা পেতে গিয়ে তার আত্মসম্মান হানি হত না অথবা কোনো মানুষের কাছে ছোট হতে হতো না।

কখনো কখনো অর্থের বিনিময়ে রাস্তায় বহনের কাজ করতে বাধ্য হতেন; অথচ তিনি সেসময় মুসলিম উম্মাহ্র ইমাম।

মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে তোষামোদ, আত্মীয়তার প্রস্তাব, উপঢৌকন ইত্যাদি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। আবার মু'তাসিমের শাসনামলে নির্যাতন, সম্পর্কচ্ছেদ্, দুর্ব্যবহার ইত্যাদি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। উভয় অবস্থাতেই তিনি ছিলেন সংযমী, নির্লিপ্ত, আত্মসম্মানী। উভয় অবস্থার মধ্যে তার কাছে পরেরটার চেয়ে আগেরটা ছিল বড় মুসিবত। বাস্তবিকই তিনি শাসকের সম্পদ গ্রহণ না করে নিজের বিরাগীপনা ও আত্মসম্মানের উপর অটল ছিলেন। এ বিষয়ে তার সম্পর্কে অনেক বিরল ঘটনা বর্ণিত আছে।

একবার মুতাওয়াক্কিলের উজির তার কাছে চিঠি লিখেন- "আমীরুল মুমেনীন আপনাকে এই উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন এবং আপনাকে তার দরবারে তশরীফ আনতে অনুরোধ করছেন। আল্লাহ্র দোহাই, আল্লাহ্র দোহাই, আপনি অমত করবেন না এবং তোহ্ফাটা ফেরত দিবেন না। যদি তা করেন তাহলে আপনার শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ পেয়ে যাবে।" এ পর্যায়ে এসে ইমাম আহ্মাদ অন্যায়-অন্ধকারকে নিরসণকল্পে শাসকের উপঢৌকন গ্রহণ করতে

বাধ্য হন। কিন্তু তারপরও তিনি নিজ হাতে ধরলেন না। বরং তার ছেলে সালেহকে নির্দেশ দিলেন অর্থটা নিতে এবং পরদিন আনসার-মুহাজিরদের অভাবী ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য গরীব-দুঃখীর মাঝে বিতরণ করে দিতে। সম্ভবত ইমাম আহ্‌মাদ মনে করেছেন তার নিজের চেয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র সম্পদে এ সকল লোকদের অধিকার অনেক বেশী। কারণ তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ: ইমাম আহমাদের আরেকটি গুণ ছিল 'ইখলাস'। সত্য সন্ধানে ইখলাস বা আন্তরিকতা থাকলে আত্মা বৈষয়িক মোহ্ থেকে পবিত্র থাকে। ফলে অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, সঠিক বুঝ লাভ করা যায় এবং জ্ঞান ও হেদায়াতের আলোতে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই ইমাম আহমাদ রিয়া (লৌকিকতা) থেকে বেঁচে থাকতেন এবং এজন্য যারপর নাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। যখন কোথাও যেতেন শত চেষ্টা করতেন যেন লোকেরা তার আগমনের কথা শুনতে না পায়। তিনি বলতেন, "আমি মক্কায় যাচ্ছি। মক্কায় গিয়ে কোনো একটা পাহাড়ের গিরিপথে আস্তানা গাঁড়ব যেন কেউ আমাকে চিনতে না পারে।"

পঞ্চম গুণ: ইমাম আহমাদের আরেকটি গুণ ছিল, যে গুণের কারণে তার দার্‌স ও আলোচনা মানুষের অন্তরে স্থায়ীভাবে স্থান করে নিয়েছিল তা হল- গাম্ভীর্যতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর ও শান্ত। তার এ শান্তপ্রকৃতি ও গাম্ভীর্যতার কারণে মানুষ তাকে সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত। এ যেন হাদীসের বাণীর বাস্তব নমুনা "যে আল্লাহ্‌র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্‌ তাকে উপরে উঠান"। তার সমকালীন জনৈক ব্যক্তি বলেন, "আমি ইসহাক ইবন ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাত করেছি, অমুক অমুক বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করেছি কিন্তু আহমাদ ইবন হাম্বলের মত গম্ভীর্যতা আর কারো মাঝে দেখিনি। আমি একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য তার কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার গাম্ভীর্যতা দেখে ভয়ে আমার কাঁপুনি এসে গেল।"

অগ্নি পরীক্ষার মুখোমুখি: তার এ পরীক্ষা শুরু হয় খলিফা মামুনের এক চিঠির মাধ্যমে। ২১৮ হিজরীতে খলিফা মামুন বাগদাদের গভর্নরের কাছে এই মর্মে পত্র পাঠান যে, বিচারক ও খতীব পদে নিযুক্ত আলেমদেরকে একত্রিত করে কুরআনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

কর। তাদের মধ্যে যারা 'কুরআন সৃষ্ট'[12] এ কথা বলবে না তাদেরকে পদচ্যুত কর। গভর্নর খলিফার আদেশ মত আলেমদেরকে সম্মিলিত করলেন। মাত্র চারজন আলেম ব্যতীত বাকী সবাই উক্ত কথা মেনে নেয়। তখন গভর্নর এ চারজন আলেমের উপর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। তাদেরকে জেলে পুরে লোহার শিকল পরানো হয়। নির্যাতনের ফলে চারজনের দুইজন উক্ত কথা মেনে নেন। বাকী থাকেন আহমাদ ইবন হাম্বল এবং মুহাম্মদ ইবন নূহ। মামুন নির্দেশ দিল এ দুজনকে তার কাছে পাঠানোর জন্য। তখন গর্ভনর তাদের দুজনকে লোহার শিকল পরিয়ে মামুনের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু বন্দীরা খলিফার দরবারে পৌঁছার আগে মামুন রাক্কা[13] নামক স্থানে ইহদাম ত্যাগ করে। এদিকে পথিমধ্যে ইবনে নূহ মারা যান। বাকী থাকেন শুধু ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ।

আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াতের আকীদা হল- "কুরআন সৃষ্ট নয়। কুরআন আল্লাহ্র বাণী।– [অনুবাদক] আর আল্লাহর বাণী আল্লাহর গুণ। আল্লাহর সত্তার সাথে সম্পর্কিত কোনো কিছু সৃষ্ট নয়। এটিই হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা। [সম্পাদক]

ইরাকের একটি শহরের নাম। -অনুবাদক

এরপর মু‘তাসিম ক্ষমতায় আসেন। তিনি সুঠাম দেহের মানুষ ছিলেন। এমনকি সিংহের সাথে পর্যন্ত কুস্তি করার ক্ষমতা রাখতেন তিনি। কিন্তু তার ইল্‌ম-কালাম কিচ্ছু ছিল না। কারো সাথে বিতর্ক করার সামান্যতম যোগ্যতাও তার ছিল না। কিন্তু তিনি তার ভাই মামুনকে শ্রদ্ধা করতেন, তাকে আদর্শ হিসেবে মানতেন, ফলে তার মতানুসারেই তিনি চললেন।

ইমাম আহমাদ জেলেই পড়ে থাকলেন। তার স্বাস্থ্য প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তিনি সার্বক্ষণিক ইবাদতে মশগুল থাকতেন, আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকতেন। ইমাম আহমাদের ছেলে বর্ণনা করেন যে, তার বাবা জেলে থাকা অবস্থায় তিনি কিতাবুল ইরজা ও অন্যান্য কিতাব পড়াতেন এবং লোহার বেড়ী পরা অবস্থায় বন্দীদের নিয়ে নামাজে ইমামতি করতেন। শুধু পায়ের বন্ধনটা নামাজের সময় এবং ঘুমের সময় খুলে দেওয়া হত।

মু‘তাসিম তার পক্ষের আলেমদেরকে এবং তার নেতৃবৃন্দকে পাঠাতেন ইমাম আহমাদের সাথে বিতর্ক করার জন্য। ইমাম আহমাদ বিতর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি বলতেন, কুরআন অথবা সুন্নাহ্‌র দলীল ছাড়া কোনো মতৈক্য হবে না। একবার তাকে

মু‘তাসিমের দরবারে উপস্থিত করা হয় এবং তার সামনে আলোচনা চলে। তখন তিনি প্রতিপক্ষকে বারবার শুধু এ কথাই বলেন, “আমাকে আল্লাহ্‌র কিতাব অথবা রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ্ থেকে একটা দলীল দিন।” অনেক উপঢৌকন ও পদের লোভ দেখিয়ে তারা তাকে বশ করার চেষ্টা করেছে। তদ্রূপ নানা প্রকার শাস্তির ভয় দেখিয়েও তারা তাকে বাগে আনার কসরত করেছে। কিন্তু কিছুতেই তারা তাকে তার মত থেকে সরাতে পারেনি।

তারা তার কাছে আলেমদেরকে পাঠাত। সেসব আলেমরা মিথ্যা ভান করে তার কাছে আসত। তিনি তাদেরকে বলতেন, “আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হত, তবুও তারা হার মানতেন না।” একবার তিনি বললেন, “আমি জেলকে ভয় পাই না, কিন্তু মারকে ভয় পাই।” তিনি এ ভয়ে উক্ত কথা বলেন- হয়ত সহ্য করতে না পেরে তার বুদ্ধির বিকৃতি ঘটবে। তখন তার সাথে জেলবন্দী এক চোর তাকে বলল, “আমাকে অন্ততঃ বিশবার প্রহার করা হয়েছে। বেত্রাঘাতের সংখ্যা হবে হাজার হাজার। আমি দুনিয়ার জন্য তা সহ্য করতে পেরেছি; আর আপনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে

সামান্য ক'টি বেত্রাঘাতকে ভয় করছেন। আপনি দুইটা বা তিনটা বেত্রাঘাত টের পাবেন, এরপর আর কিছুই টের পাবেন না।" এ চোরের কথায় তার কাছে বিষয়টাকে হালকা মনে হল।

এরপরও যখন মু'তাসিম তাকে বশে আনতে পারল না তখন তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করল। যন্ত্রের উপরে তাকে সটান শুইয়ে দিয়ে তারা তাকে পিটাতে শুরু করল। প্রথম আঘাতেই তার কাঁধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং পিঠ থেকে পিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। তখন মু'তাসিম তার কাছে গিয়ে বলল, আহমাদ! এই কথাটা বল। আমি নিজ হাতে তোমার বাঁধন খুলে দিব এবং তোমাকে অনেক উপঢৌকন দিব। কিন্তু ইমাম আহমাদ বললেন, আমাকে একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস দিয়ে এর পক্ষে দলীল দাও।

তখন মু'তাসিম জল্লাদকে বলল, "তোর হাতের উপর লানত হোক! আরো কঠিনভাবে শাস্তি দে।"

এরপর তাকে দ্বিতীয় আঘাত করা হল। তখন তার গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল।

মু‘তাসিম তাকে বলল, কেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ? তোমার সাথীদের কেউ তো এ পথ বেছে নেয়নি।

মারওয়াযি জনৈক আলেম তাকে বলেন, ‘আল্লাহ্ তাআলা কি বলেননি, “তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না।” তখন ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে বলেন, মারওয়াযি দেখ দরজার বাইরে কারা? তখন মারওয়াযি প্রাসাদের আঙ্গিনায় বেরিয়ে দেখেন সেখানে অগনিত মানুষ কাগজ কলম নিয়ে বসে আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এখানে কি করছ? তারা বলল, ইমাম আহমাদ কি জবাব দেন আমরা তা লিখে রাখি। এরপর মারওয়াযি ফিরে এলেন। তারপর ইমাম আহমাদ বললেন, মারওয়াযি! আমি কি এদের সকলকে পথভ্রষ্ট করতে পারি? আমি নিহত হলেও এদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারব না।”

তারপরও যখন মু‘তাসিম ইমাম আহমাদকে বশ করতে পারছিল না তখন জল্লাদকে বলল, আরো কঠোরভাবে মার। তখন একজন জল্লাদ এসে মাত্র দুইটি বেত্রাঘাত করে চলে যেত। তারপর অন্যজন আসত। এভাবে মারতে মারতে তার দুই কাঁধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। রক্তে তার পিঠ ভেসে যাচ্ছিল। যেন তিনি মরে গেছেন। তখন

মু‘তাসিম ভাবল যদি তিনি মারা যান তাহলে লোকেরা বিদ্রোহ শুরু করবে। এই ভয়ে তাকে নির্যাতন করা বন্ধ করে তার পরিবারের কাছে সমর্পণ করে।

তার অসুস্থতা ও মৃত্যু: মারওয়াযি বলেন, আবু আব্দুল্লাহ্ ২রা রবিউল আউয়াল বুধবার রাত্রে অসুস্থ হন। দীর্ঘ নয়দিন অসুস্থ ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি লোকদেরকে সাক্ষাত করার অনুমতি দিতেন। লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করে তাকে সালাম জানাত। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে সালামের উত্তর দিতেন...। তিনি নিরিবিলি থাকতেন না। কখনো বসে, কখনো শুয়ে নামাজ আদায় করতেন। ইশারা করে রুকু-সিজদা করতেন। একবার আমি তার জন্য বাসন ধরেছিলাম। দেখলাম তার পেশাব পেশাব নয়, বরং তাজা রক্ত। ব্যাপারটি আমি ডাক্তারকে জানালাম। ডাক্তার বললেন, উদ্বিগ্নতা ও দুঃশ্চিন্তা এই ব্যক্তির পেটকে ছিদ্র করে ফেলেছে। বৃহস্পতিবারে তার রোগ তীব্র আকার ধারণ করে। ঐদিন আমি তাকে ওজু করিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আঙ্গুলগুলো খিলাল করে দাও। শুক্রবার রাতে তিনি আরো বেশী দূর্বল হয়ে পড়েন। সকাল বেলা তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর খবর শুনে মানুষ চিৎকার করে

কেঁদে উঠে। কান্নার রোলে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠে, পুরা দুনিয়া কেঁপে উঠে। রাস্তাঘাট, অলিগলি সব মানুষে ভরে যায়।

মারওয়াযি বলেন, "মানুষ জুমার নামাজ শেষে বের হওয়ার পর আমি লাশ বের করলাম।" আব্দুল ওহ্হাব আলওচ্ছাক বলেন, "জাহেলী যুগে বা ইসলামী যুগে কোথাও এত মানুষের সমাগমের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এত জনতার সমাগম হয়েছে যে পানির অভাবে মানুষকে তাইয়্যাম্মুম করতে হয়েছে এবং অতি ভিড়ের কারণে তা বিপজ্জনক এলাকায় পরিণত হয়েছে। লোকেরা তাদের বাড়ীর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে যারা ওজু করতে চায় তাদেরকে ওজু করার জন্য ডাকাডাকি করেছে।"

আল্লাহ্ তাআলা ইমাম আহমাদকে তার অশেষ রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন, তার জান্নাতে স্থান দিন এবং ইমাম আহমাদের সাথে আমাদেরকেও তার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

চার মাযহাবের ইমামদের প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি

চার মাযহাবের ইমামদের প্রতি বার-ইমামের অনুসারী শিয়াদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

বার ইমামের অনুসারী (ইমামিয়া) শিয়াদের প্রবীন ও নবীন সকল আলেমের দৃষ্টিভঙ্গি সুন্নী মাযহাবের চার ইমামের প্রতি শত্রুতাপূর্ণ।

অবশ্য যারা মাযহাবের ইমামদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ রাসূলের সাহাবী ও তাঁর স্ত্রীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে পারে তাদের কাছ থেকে এটা বিরল কিছু নয়।

ইমামিয়াদের কিতাবাদি সুন্নী মাযহাবের চার ইমামের বিষোদগারে ভরপুর। যেমন শিয়া আলেম কুলাইনী তার সনদে আবু জাফর আল-বাকের[14] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (বাকের) কিবলামুখী হয়ে বলেন, মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে এ পাথরগুলোর (বাইতুল্লাহর) সন্নিকটে এসে সেগুলোকে তাওয়াফ করতে। তারপর আমাদের কাছে এসে আমাদের মিত্রতার ঘোষণা দিতে। আদেশটা যে আয়াতে দেওয়া হয়েছে তা হল- ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ

---

[14] নিশ্চয় এ বর্ণনাটি ইমাম বাকের উপর শিয়াদের মিথ্যারোপ, তিনি কখনও এ ধরণের কথা বলেন নি। [সম্পাদক]

﴿ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ ﴾ [طه: ٨٢] "নিশ্চয় আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাশীল যে তাওবা করল, ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, অতঃপর দিশা পেল।" [সূরা ত্বহা ৮২] অতঃপর বাকের হাত দিয়ে নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন অর্থাৎ আমাদের মিত্রতার দিশা পেল। এরপর বাকের বললেন, হে সুদাইর[15]! যারা মানুষকে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশে বাধা দেয় আমি কি তোমাকে সেসব লোকদের দেখিয়ে দিব না? সেসময় আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী মসজিদে গোল মজলিসে বসা ছিলেন। তখন তিনি (বাকের) তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, এরা মানুষকে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশে বাধা দেয়, এদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। যদি এ খারাপ লোকগুলো তাদের বাড়ীঘরে বসে থাকত, তাহলে আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানার জন্য লোকেদেরকে আমাদের কাছে আসতে হত। তখন আমরা লোকদেরকে আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানাতে পারতাম।"[16]

এই রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী।

উসুলুল কাফী (১/২৯২-২৯৩)।

আওয়া-লী[17] নামে শিয়াদের অন্য এক আলেম বলেন, “পরিচ্ছেদ: তাদের (সুন্নীদের) চার ইমাম ও সকল বিদআতী আলেম এবং তাদের উদ্ভাবিত বিদআতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিশেষতঃ আবু হানীফা, যার মাঝে সামান্যতম আল্লাহ্‌র ভয়ও নাই, সে নিকৃষ্টতম বিদ‘আতের উদ্ভাবক।”[18]

কাজী ইয়ায তারতীব গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইমামিয়াদের অনুসারী এক ব্যক্তি ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করে “আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সবচেয়ে উত্তম লোক কে?” মালেক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। সে বলল,

---

তার নাম ইউসুফ ইবন আহমাদ ইবন ইব্রাহীম আদদারানী আলআওয়া-লী আলবাহরাইনী। তিনি বাহরাইনের ইমামিয়া শিয়াদের আলেম। سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد নামে তার একখানি গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ১১৮৬ হিজরীতে কারবালায় মারা যান এবং সেখানেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। [মু‘জামুল মুয়াল্লিফীন ১৩/২৬৮-৯]

দেখুন: আস সা-রিমুল হাদীদ ফি উনুকি সাহিবি সালাসিলিল হাদীদ, লেখক: আবুল ফাউয মুহাম্মদ আসসুওয়াইদি। পাণ্ডুলিপি (ق৬৪৮/أ) এবং আওয়ালির সালাসিলুল হাদীদ।

তারপর কে? তিনি বললেন, অন্যায়ভাবে নিহত খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু। তখন এই রাফেযী লোকটি মালেক রাহিমাহুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলল, “আল্লাহ্‌র শপথ আমি কখনো তোমার সাথে বসব না।”[19]

তদ্রুপ ইমামদের প্রতি তাদের শত্রুতার আরো নমুনা দেখা যায় তাদের জনৈক কবির কবিতাতে। সে তার কবিতার কিছু পংক্তি নিম্নরূপ:

“যদি তুমি নিজের জন্য সন্তোষজনক কোনো মাযহাব পেতে চাও যা তোমাকে হাশরের দিন জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে,

তাহলে শাফেয়ী, মালেক, আহমাদ, নুমান অথবা কাব আহবারের[20] মাযহাব পরিত্যাগ কর,

---

তারতিবুল মাদারিক ফি আসমা-ই মান রাওয়া আনিল ইমাম মালেক মিন শুয়ুখিহি (১/১৭৪-১৭৫)।

তিনি হচ্ছেন- কা’ব আল-আহবার ইবন মানে’। তার উপনাম হচ্ছে- আবু ইসহাক। তিনি ইয়াহূদী ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসেন। পরবর্তীতে

এবং এমন লোকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোল যাদের হাদীস আমাদের নানা জিব্রাইলের মাধ্যমে বারী তায়ালার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।”[21]

শিয়া ইমাম ‘হিল্লি’র ‘মুখতালিফুস শিয়া’ নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে চার ইমামের প্রতি তাদের ন্যাক্কারজনক দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি নমুনা ফুটে উঠেছে:

“লোকেরা বলল, তুমি কোন কারণে তোমার জুতা সাথে নিয়ে এলে? এটাতো বুদ্ধিমান তো দূরে থাক কোনো মানুষের কাজ হতে পারে না। সে বলল, আমি আশংকা করেছি কোনো হানাফী আমার জুতাটা

শামে চলে যান এবং হিম্‌স এলাকায় বসবাস করেন। তিনি উমর, আয়েশা ও সুহাইব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ৩২হিজরীতে তিনি মারা যান। [ইবনুল জাওযির সিফাতুস সাফওয়া (৪/২০৩-২০৫)]

দেখুন: মাজলিসির ‘বিহার’ গ্রন্থে (১০৮/১১৭), বায়াযীর ‘আসসিরাতুল মুসতাকিম’ গ্রন্থে (৩/২০৭), অনুরূপভাবে দেখুন: শায়খুল ইসলামের ‘মিনহাজুস সুন্নাহ্ আননাবাওয়িয়্যিয়াহ্’ (৪/১০৩)। সেখানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পক্ষ থেকে এ কবিতাগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।

চুরি করে নিয়ে যাবে, যেভাবে আবু হানীফা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জুতা চুরি করেছিল।

হানাফীরা চিৎকার দিয়ে উঠল। একি বলছে! কক্ষনো নয়! রাসূলের যুগে কি আবু হানীফা ছিল? তার তো জন্ম হয়েছে রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের একশ বছর পর।

তখন সে বলল, ও- না। ভুল হয়েছে সে লোকটা ছিল শাফেয়ী।

তখন শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা চিৎকার দিয়ে উঠল। তারা বলল, শাফেয়ীর জন্ম হয়েছে আবু হানীফার মৃত্যুর দিন। তিনি চার বছর মায়ের পেটে ছিলেন; আবু হানীফার সম্মানার্থে বের হননি। যখন আবু হানীফা মারা গেল তখন তিনি বের হলেন। তার জন্ম হয় রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর দুইশ বছরের মাথায়।

সে বলল, ও আচ্ছা। তাইলে বোধহয় লোকটা ছিল মালেক।

তখন মালেকী মাযহাবের লোকেরাও হানাফী মাযহাবের লোকদের মত উত্তর দিল।

তখন সে বলল, তাহলে বোধহয় লোকটা ছিল আহমাদ ইবন হাম্বল।

তখন হাম্বলী মাযহাবের লোকেরা শাফেয়ী মাযহাবের লোকদের মত উত্তর দিল।

সেই আল্লামা এবার বাদশাহর দিকে ফিরে বলল: আপনি জেনেছেন যে, চার মাযহাবের প্রধান ব্যক্তিত্বদের কেউ রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে ছিল না, এমনকি সাহাবীদের যুগেও ছিল না। এটা তাদের (সুন্নীদের) একটা বিদ'আত যে তারা তাদের মুজতাহিদ আলেমদের মধ্য থেকে শুধু এই চারজনকে বেছে নিয়েছে। এই চারজনের একজন যে ফতোয়া দিয়ে গেছে এর বিপরীত কোনো ফতোয়া তাদের চেয়ে অনেকগুণ ভাল কোনো মুজতাহিদের জন্য দেওয়াও বিধেয় নয়।

তখন বাদশাহ বলল, তাদের একজনও রাসূলের যুগে বা সাহাবীদের যুগে ছিলেন না?

তখন তারা জবাব দিল সমস্বরে, না।

তখন ঐ শিয়া আলিম বললো, আমরা আমীরুল মুমেনীন আলী আলাইহিস সালামের অনুসারী। যিনি ছিলেন রাসূলের সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণ, তার ভাই, তার চাচার ছেলে এবং তার প্রতিনিধি।

সে যাই হোক, বাদশাহ যে তালাক দিয়েছেন তা বাতিল (পতিত হবে না)। যেহেতু এর মধ্যে তালাক কার্যকর হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়নি। তালাক সঠিক হওয়ার শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হল দুজন ন্যায়পরায়ন লোকের উপস্থিতিতে তালাক দেওয়া। বাদশাহ্ কি এমন দুইজন লোকের উপস্থিতিতে তালাক দিয়েছেন? বাদশাহ্ বলল: না। এরপর অন্যান্য আলেমদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে এবং সবাইকে তার কথা মানতে বাধ্য করে।”[22]

শিয়া আলেম নেয়ামতুল্লাহ্ জাযায়েরী কোত্থেকে আরেকটি অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করে:

সে বলে, আলী (আলাইহিস সালাম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “একবার মুসা ইবন ইমরান এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

দেখুন: হিল্লির ‘মুখতালিফুস শিয়া’, পৃষ্ঠা ১১০। কুমের ‘মুআস্সাসাতুন নাশরিল ইসলামী’ থেকে প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ ১৪১৭ হিঃ।

লোকটি দু'হাত আকাশের দিকে তুলে দো'আ করছিল। মুসা 'আলাইহিস সালাম তো তার প্রয়োজনে চলে গেলেন। তারপর সাতদিন এ লোকটির সাথে মুসা 'আলাইহিস সালামের আর দেখা হয় নাই। সাতদিন পরে যখন মুসা 'আলাইহিস সালাম ঐ স্থান দিয়ে আবার যাচ্ছিলেন তখনো দেখলেন যে লোকটি দুহাত তুলে দো'আয় রত আছে, কান্নাকাটি করছে, তার যা প্রয়োজন তার জন্য দো'আ করছে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা মুসার কাছে অহী পাঠালেন, হে মুসা! এই লোকটি যদি দো'আ করতে করতে তার জিহ্বা ছিঁড়ে পড়ে যায় তবুও আমি দো'আ কবুল করব না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ দরজা দিয়ে না আসে যে দরজা দিয়ে আমি তাকে আসার নির্দেশ দিয়েছি।"

এই বর্ণনার উপর টীকা লিখতে গিয়ে নেয়ামতুল্লাহ্ বলেন, "এই বর্ণনাটি আপনার কাছে অনেকগুলো বিষয় পরিস্কার করে দেয়। যেমন: যারা আমাদের বিরোধী (উদ্দেশ্য, সুন্নীরা) তাদের সব ইবাদত বাতিল। কারণ তারা সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেনি যে দরজা দিয়ে তাদেরকে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও তারা রোযা রাখে, নামাজ পড়ে, হজ্জ করে, যাকাত দেয়, অন্যান্য ইবাদত পালন করে এবং পরিমানে অন্যদের (শিয়াদের) চেয়ে বেশী করে। যেহেতু

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো।"[সূরা বাকারা ১৮৯] এবং মুসলিমদের নিকট সহীহভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী পৌঁছেছে যে, 'আমি জ্ঞানের শহর, আর আলী হল সে শহরের ফটক'[23] তারা (সুন্নীরা) চার মাযহাবকে তাদের মাঝে ও তাদের রব্বের মাঝে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং যাবতীয় বিধি-বিধান এসব মাযহাবের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে।"[24]

এ রেয়াওয়েতটি হাকেম তার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে: (৪৬৩৭, ৪৬৩৮, ৪৬৩৯), তাবারানী তার 'কাবীর' গ্রন্থে: (১১০৬১), খতীব তার 'তারিখু বাগদাদে': (৪/৩৪৮) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিরমিযি তার 'সুনান' গ্রন্থে: ৫/৩৩৭, নং ৩৭২৩ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। আলবানী তার 'আল জামেউস সাগীর' গ্রন্থে এ বর্ণনাটিকে **বানোয়াট** বলে রায় দিয়েছেন (নং ৩২৪৭)।

দেখুন: 'কাসাসুল আম্বিয়া' লেখক: নেয়ামতুল্লাহ্ জাযায়েরী, তাহকীক: আলহাজ্জ মুহসিন (পৃ ৩৪৪), দারুল বালাগাহ্ প্রকাশনী, বৈরুত। তৃতীয় সংস্করণ (১৪১৭ হিঃ)।

শিয়া আলেম আলী আল-আমেলী আলবায়াযী তার 'আসসিরাতুল মুসতাকিম ইলা মুসতাহিক্কিত তাকদীম' গ্রন্থে একটা অধ্যায়ের শিরোনাম দেন এভাবে: "*অধ্যায়: চার ইমামের প্রত্যেকের অসংখ্য মাসয়ালার সিদ্ধান্ত ভুল।* এই অধ্যায়ে অনেকগুলো পরিচ্ছেদ রয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: যে সকল মাসয়ালায় তারা সকলে একমত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে সকল মাসয়ালায় তারা মতপার্থক্য করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে সকল মানহানিকর মতামতকে তাদের বলে উল্লেখ করা হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বোখারী সম্পর্কে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইমাম বোখারী ও মুসলিম যে সকল হাদীসকে অস্বীকার করেছেন।'

(তারপর উক্ত লেখক বলেন), এ পর্যায়ে আমরা বলব: প্রথমত এই চার ইমাম সাহাবী নন, বরং তারা তাবেয়ী। আহলুস সুন্নাহরা তাদের নবীকে বাদ দিয়ে এসব ব্যক্তিবর্গের প্রতি মাযহাবের নিসবত করে সন্তুষ্ট। এসব ব্যক্তিরা যারা একে অপরকে ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত

করে, এমনকি একে অপরকে লা‘নত পর্যন্ত করে থাকে তাদের প্রতি মাযহাবের নিসবত না করে নবীর প্রতি মাযহাবের নিসবত করা আবশ্যকীয় ব্যাপার ছিল। আর এটা করলে নবীকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হত, তার সম্মান রক্ষা করা হত। কারণ সুন্নীরাই তো বলে যে, ‘আজ আমি তোমাদের জন্য ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’[মায়েদা:৩] এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের নবীর জীবদ্দশায় তাদের ধর্ম পূর্ণতা পেয়েছে।

এই চার ইমামের মতপার্থক্য যদি দলীলের বিভিন্নতার কারণে হয়ে থাকে তবে তারা যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে সেসব আলেমরাই তাদেরকে ফাসেক ও পথভ্রষ্ট বলে সাক্ষ্য দিয়েছে। আর যদি বলা হয় কোনো প্রকার উপলক্ষ্য ছাড়াই তারা এ ধরনের মত পার্থক্যে লিপ্ত হয়েছে তাহলে তাদেরকে কিভাবে অনুসরণ করা হবে যারা তাদের রব্বের বিধানকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে? আর যদি বলা হয় যুগের প্রয়োজনের তাগিদে তারা এ ধরনের মত পার্থক্য করেছেন তাহলে তো তারা তাদের নবীকে বেইজ্জত করল, যেহেতু তাদের নবীর যামানায় যা ছিল না তা তারা প্রবর্তন করেছে। আর যদি বলা হয় যে, তারা মনে করে যে, শরীয়তের বিধি-বিধান তাদের নবীর চেয়ে

তারা ভাল জানে, তাই তাদের নবী যা করতে পারেনি তারা তা করতে পারছে, তাহলে তো বলতে হবে তাদের মতিভ্রম ঘটেছে। শুধু তারা নয় তাদের অগ্রজরাও পথভ্রষ্ট ছিল।....[25]

শিয়া আলেম মুহাম্মদ রেযা রেযায়ী বলেন, “যদি ইসলামের দাবীদার ও সুন্নাহর দাবীদাররা আহলে বাইত ‘আলাইহিস সালামকে ভালোবাসত তাহলে তারা তাদের অনুসরণ করত এবং আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ ইবন হাম্বলের ন্যায় পথভ্রষ্ট লোকদের কাছ থেকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান গ্রহণ করত না। যাদের একজনও আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি এবং তার কাছ থেকে একটা হাদীসও বর্ণনা করেনি। আর আহলে বাইত ‘আলাইহিমুস সালামকে ভালোবাসা মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিদান দেওয়া। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, ‘(হে রাসূল) আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান

আলী আলবায়াযীর ‘আসসিরাতুল মুস্তাকিম ইলা মুসতাহিক্কিত তাকদীম’ (৩/১৮১), প্রকাশক: নাশরুল মাকতাবা আলমুরতাজাউয়্যিয়্যাহ লি এহইয়া ইল আসার আলজাফরিয়া, হায়দরী প্রেস।

চাই না। শুধু চাই আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি সৌহার্দ্য।' [সূরা শুরা:২৩] আর আহলে বাইতকে ভালোবাসার লক্ষণ হল- কথা ও কাজে তাদেরকে অনুসরণ করা। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন।" [সূরা আলে ইমরান: ৩১] এবং তাদের নানার হাদীস তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা। যেহেতু ঘরের লোক ঘর সম্পর্কে বেশী জানে। চার মাযহাবের ইমামরা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তা না হলে তাদের এ মেকি ভালোবাসার আর কি আলামত আছে?"[26]

কিতাব: কাযাবু আলাশ শিয়া, লেখক: মুহাম্মদ রেযা রেযায়ী (পৃ ২৭৯)।

চার ইমামের প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত আলোচনা

- চার ইমামকে মূর্খ আখ্যায়িত করা এবং এই দাবী তোলা যে, হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে শিয়া বার-ইমামের উপরই তারা নির্ভরশীল ছিলেন।
- চার ইমামকে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মাযহাব উদ্ভাবনের অভিযোগে দুষ্ট করা
- এ অভিযোগ তোলা যে, চার মাযহাব শাসকদের মন মত গতি পরিবর্তন করে
- ইমাম আবু হানীফার রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের অপবাদ
- ইমাম মালেকের রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের অপবাদ
- ইমাম শাফেয়ীর রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের অপবাদ
- ইমাম আহমাদের রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের অপবাদ

ইমামিয়াদের অপবাদ: ‘সুন্নী মাযহাবের ইমামরা মূর্খ এবং হাদীস ও ফিকহের ক্ষেত্রে তারা ইমামিয়া আলেমদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন’

সুন্নী মাযহাবের ইমামদের প্রতি বারো-ইমামের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইমামিয়া শিয়াদের বড় অপবাদ হল- তারা ছিলেন মূর্খ এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ। তারা ইলমের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের আলেমদের কাছে ঋণী। এই মর্মে তাদের প্রাচীন ও সমকালীন গ্রন্থাবলীতে অনেক উদাহরণ রয়েছে।

শিয়া আলেম মুহাম্মদ ইবন উমর আলকিশ্বি[27] ইমাম আহমাদের ব্যাপারে বলেন, “মূর্খ, আহলে বাইতের শত্রু, তাঁতের কাজ করত, (বা নকল করতে প্রাজ্ঞ) সে ফিকহবিদ নয়।”[28]

তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন উমর ইবন আব্দুল আযিয আবু আমর আল কিশ্বি। শিয়া আলেম তুসী তার ব্যাপারে বলেন, “তিনি নির্ভরযোগ্য, তার কাছে রেওয়ায়েতের জ্ঞান আছে এবং তার আকীদা ভাল। [রিজালুন নাজ্বাশী (পৃ: ৩৭২) ও ফাহরাসাতুত তুসী (পৃ: ১৪১)।

বায়াযী তার কাছ থেকে আসসিরাতুল মুসতাকিমে উল্লেখ করেছেন (৩/২২৩)।

অনুরূপভাবে মুহাম্মদ বাকের আলমাজলেসি 'বিহার'[29] নামক গ্রন্থে চার মাযহাবের ইমামদের মূখর্তা প্রমাণ করার জন্য অনেকগুলো রেওয়ায়েত নিয়ে এসেছে। বিশেষতঃ আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এর ব্যাপারে।

সে তার বিহার গ্রন্থে[30] একটা পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছে এভাবে, "মানুষের কাছে সঠিক ইলম যা আছে তা কেবল আহলে বাইতের কাছ থেকে যা তাদের কাছে পৌঁছেছে।"[31]

অনুরূপভাবে বায়াযী[32] তার 'সিরাত' গ্রন্থে[33] একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দেয় এভাবে, "অধ্যায়: চার ইমামের প্রত্যেকের অসংখ্য মাসয়ালার সিদ্ধান্ত ভুল।"

দেখুন: মুনাযারাত বায়না আবি হানীফা ওয়া জাফর আসসাদেক (২/২৮৬-২৯৫), (১০/২১২-২১৫) এ ছাড়া মুনাযারাত বায়না আবি হানীফা ওয়া শায়তানুত ত্বাক (১০/২৩০-২৩২)।

দেখুন: (২/১৭৯)।

[31]বারো ইমামের অনুসারী সমকালীন শিয়া হাসেম, যে হুসাইনী নামে পরিচিত। সে দাবী করে যে, চার ইমামের প্রত্যেকে কোন না কোন শিয়া আলেমের ছাত্র ছিল। দেখুন তার লেখা বই 'আল মাবাদি আল আরবাআ' লিল ফিকহিল জাফরী' (পৃ: ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৬, ৩৮২)।

তদ্রূপ বারো ইমামের অনুসারী শিয়া আমীর মুহাম্মদ আল-কাযউইনী বলেন, "তাদের মধ্য থেকে ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবন সাবিত ফিকহ শিখেছে ইমাম জাফর ইবন মুহাম্মদ আস-সাদেকের কাছ থেকে। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের হাদীসের ও ফিকহের ওস্তাদ ছিল মুহাম্মদ ইবন ফুযাইল ইবন গাযওয়ান আদ্দব্বী[34] এবং তার সাথে আরো শিয়ারা ছিলেন।"[35]

তিনি হচ্ছেন- আলী ইবন ইউনুস আলআমেলী আননাবাতী আলবায়াযী যাইনুল আবেদীন আবু মুহাম্মদ বার ইমামের অনুসারী তর্কবিদ। তার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে- আসসিরাতুল মুস্তাকিম ইলা মুসতাহিক্কিত তাকদীম, আল লুমআহ্ ফিল মানতেক, তার মৃত্যু ৮৭৭হিঃ। [আমালুল আ-মাল (১/১৩৫), মু'জামুল মুআল্লিফীন (৭/২৬৬)।

দেখুন: বায়াযীর আসসিরাতুল মুস্তাকিম (৩/১৮১) ও তার পরবর্তী অংশ। এছাড়া আবু হানীফাকে মূর্খতা ও অল্প ইলমের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন (৩/২১১, ২১৩-২১৪) পৃষ্ঠাতে।

তার কাছ থেকে সাওরী, ইমাম আহমাদ, ইবনে রাহুইয়াহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার বলেছেন, 'সে কট্টর শিয়া'।" [দেখুন: আললিসান(৭/৩৭২)।

আশ শিয়া ফি আকায়িদিহিম (পৃ:১৫)।

এ অভিযোগের জবাব:

এক: একটি বা দু'টি হাদীস কোনো ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করা দ্বারা কোনো মতেই একথা সাব্যস্ত করা যায় না যে, বর্ণনাকারী ঐ ব্যক্তির ছাত্র ছিলেন। যেমন ইমাম আহমাদ ও অন্য সুন্নীরা 'মুহাম্মদ ইবন ফুযাইল ইবন গাযওয়ান আদ্দব্বীর কাছ থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। বরঞ্চ হাদীস শাস্ত্রে একটি পরিভাষা আছে 'অনুজের কাছ থেকে অগ্রজের বর্ণনা' আরেকটি পরিভাষা আছে 'ছাত্রের কাছ থেকে শিক্ষকের বর্ণনা'।[36]

তদ্রূপ কারো কাছ থেকে কোনো একটা হাদীস বর্ণনা করার মানে এ নয় যে, সে ব্যক্তি বর্ণনাকারীর চেয়ে বেশী ইলম রাখেন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অনেক রাবীর

উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন 'ইনতিকা' (পৃ: ১২), 'তারতীবুল মাদারিক ফি আসমায়ি মান রাওয়া আনিল ইমাম মালেক মিন শুয়ুখিহি' (১/২৫৪-২৫৬)।

বোধশক্তি তার শ্রোতার চেয়ে কম। আবার অনেক রাবীর আদৌ বোধশক্তি নেই।'[37]

তবে এখানে একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখি যে, এ ক্ষেত্রে বারো-ইমামী ইমামিয়া শিয়ারা একটা চতুরামি করে। তাহলো, যে কোনো মুহাদ্দিসের ব্যাপারে শিয়া বলা হলেই তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সে লোক তাদের দলে- রাফেযী বা কট্টরপন্থী শিয়া।[38] প্রকৃতপক্ষে সুন্নী মাযহাবের আলেমরা 'বারো -ইমামের অনুসারী' শিয়াদের কাছ থেকে একটা হাদীসও বর্ণনা করে নি। তবে মুফাদ্দিলা[39] শিয়াদের কাছ থেকে তাদের কিছু রেওয়ায়েত আছে।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযি তার জামে' গ্রন্থে (নং ২৬৫৬) উল্লেখ করে বলেছেন: হাসান হাদীস। এছাড়া আবু দাউদ তার সুনান গ্রন্থে (নং ৩৬৬০), ইবনে মাজাহ্ তার সুনান গ্রন্থে (নং ২৩০) এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে (নং ৬৭) যায়েদ ইবন সাবেতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ আলু কাশেফ আল গাত্তাহ্ তার 'আসলুশ শিয়া' গ্রন্থে (৭৫-১০৬) এবং আমীর কাযউনী তার 'আশ শিয়া ফি আকায়িদিহিম' গ্রন্থে (পৃ:১৭) অনেক সাহাবী ও তাবেয়ীকে কট্টরপন্থী শিয়া হিসেবে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছে এবং তাদেরকে বর্তমান রাফেজীদের পূর্বপুরুষ বলে দাবী করেছে।

[39] মুফাদ্দিলা শিয়া তাদেরকে বলা হয় যারা আবু বকর ও উমরের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উপর আলীকে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু অগ্রগন্য মনে করত। কিন্তু তারা আবু

দুই: এক ব্যক্তি থেকে সামান্য কিছু হাদীস বর্ণনা করা আর তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার ইলমের উপর নির্ভর করা- এ দুয়ের মাঝে অনেক ফারাক। অথচ এ পন্থায় বার-ইমামের অনুসারী এসব শিয়ারা বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। এ জন্য জাফর সাদেক রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে সুন্নী চার ইমাম যে সামান্য কটি হাদীস বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে বলতে গিয়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "এই চারজন ইমাম জাফর সাদেকের কাছ থেকে ফিকহের কোনো নীতিমালা গ্রহণ করেন নি। তবে তারা তার কাছে থেকে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন যেমনিভাবে অন্যদের কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা

বকর ও উমরে রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার নেতৃত্ব, তাদের দীনদারীর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিল এবং এ দুজনকে তারা মহব্বতও করত। পক্ষান্তরে 'বার-ইমামের অনুসারী' শিয়াদের বিশ্বাস হল আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কাফের। যেহেতু তাদের বিশ্বাস হল- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তীতে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু খলিফা হবেন এই মর্মে সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে। সুতরাং যারা আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর আগে খিলাফতের দায়িত্ব নিল তারা জোরপূর্বক তা নিয়ে গেল।

করেছেন। আর অন্যদের কাছ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সংখ্যা জাফর সাদেক থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসের দ্বিগুণ, চতুর্গুণ”[40]

আমরা একথাও বলতে পারি যে, আহলুস সুন্নার ইমামরা আবু আব্দুল্লাহ্ জাফর সাদেকের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করাটা আশ্চর্য্যের কিছু নয়। কারণ এতো সুন্নীর কাছ থেকে সুন্নীদের হাদীস বর্ণনা। শিয়ারা যদি দাবী করে যে, জাফর সাদেক তাদের দলের,- বরঞ্চ চতুর্থ খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর ব্যাপারেও তারা এ রকম দাবী করে- শুধু দাবী করলেই তো তারা তাদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন না। বরং এ দুই ব্যক্তি শিয়াদের (মতাদর্শ) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শিয়ারা ‘কাফী’ নামক কিতাবে বা তাদের অন্যান্য কিতাবে এ দুজনের নামে এবং আহলে বাইতের অন্যান্যদের নামে যেসব বানোয়াট বর্ণনা উল্লেখ করেছে সেগুলো দ্বারা বাস্তবতাকে পরিবর্তন করা যাবে না।

তিন: অনুরূপভাবে এ দিক থেকেও তাদের এ দাবীর অসারতা প্রমাণিত হয় যে, এ চারজন ইমাম এবং তাদের ছাত্ররা কখনোই

মিনহাজুস সুন্নাহ্ (৭/৫৩৩)।

দাবী করেননি যে, তারা বারো-ইমামী বিশ্বাসী শিয়া এবং তারা এ মতবাদকে মেনেও নেননি। তাহলে এ কথা কতটুকু যুক্তিযুক্ত যে, তারা হাদীস ও ফিকহের যাবতীয় ইলম বারো-ইমামী মতবাদে বিশ্বাসী শিয়াদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন? পাত্রের ভেতরে যদি ঘোল থাকে তাহলে ঘোল বের হবে, আর দুধ থাকলে দুধ বের হওয়াই স্বাভাবিক।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "এটা জানা কথা যে, মুসলিমদের নামকরা আলেমদের মধ্যে কেউ রাফেযী ছিলেন না। বরং রাফেযীদের মূর্খতা ও বিভ্রান্তির ব্যাপারে তারা সকলে একমত।...তারা সবসময় রাফেযীদের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার এমন সব উদাহরণ পেশ করে থাকেন যা থেকে জানা যায় যে, তাদের বিশ্বাস হল 'রাফেযীরা অজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট এবং উম্মতে মুসলিমার নানা ফেরকার মধ্যে হেদায়েত থেকে সবচেয়ে বেশী দূরে।"[41]

প্রাগুক্ত (৪/১৩০-১৩১)।

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেন, “আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, অসংখ্য আলেম ও বিভিন্ন মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমার প্রচুর পড়াশুনা থাকা সত্ত্বেও আমি এমন একজন আলেমও পাইনি যার সামান্যতম খ্যাতি আছে অথচ তিনি ইমামিয়া মতবাদের প্রতি অনুরক্ত। এ কথা বলাতো দূরে থাক্ যে, তাদের কেউ গোপনে এই মতবাদ বিশ্বাস করতেন।”[42]

সুন্নী আলেম আব্দুল কাহের আল বাগদাদী বলেন, “আল্লাহ্র প্রশংসা, তাঁর অনুগ্রহে ‘ফিকহের কোনো ইমাম’ অথবা ‘হাদীসের কোনো ইমাম’ খারেজী, রাফেযী... অথবা অন্যকোন বাতিল ফেরকার দলভুক্ত ছিলেন না।”[43]

এ কারণে আজ পর্যন্ত চার মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে কিছু মুতাযিলা, সুফী বা মুরজিয়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মাযহাবের ফিকহের উপর বা উসুলের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন অথবা সংকলন করেছেন এমন ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে কেউ রাফেযী হানাফী,

---

প্রাগুক্ত (৪/১৩১)।

আল ফারকু বায়নাল ফিরাক (পৃ: ৩০৮)।

রাফেযী মালেকী, রাফেযী শাফেয়ী বা রাফেযী হাম্বলী ছিলেন বলে আমরা শুনি নি। যেহেতু রাফেযী মতবাদের সাথে ইলমের কোনো সম্পর্ক নাই এবং তা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আর দুই বিপরীত মেরু কখনো এক হতে পারে না।

চার: এটা কিভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে, চার মাযহাবের ইমামরা বারো ইমামী শিয়াদের ইলমের উপর নির্ভর করেছেন- অথচ শত্রুমিত্র, আপন-পর সকলে একবাক্যে এ সকল ইমামদের অগাধ ইলম, নির্ভুল বোধশক্তি, সত্যবাদিতা ও নিখুঁত বিশ্লেষণ শক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। বিপরীত দিকে উম্মাহ্র বেশীরভাগ অংশ ইমামিয়াদের অজ্ঞতা ও মিথ্যাবাদিতার উপর সাক্ষ্য দিয়েছে, বিশেষতঃ বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইবনে তাইমিয়া বলেন, “বুদ্ধিমান সকল মুসলিম একমত যে, কাবাকে কিবলা মান্যকারীদের মধ্যে তাদের ফেরকার চেয়ে মূর্খ, পথভ্রষ্ট, মিথ্যাবাদী, বিদআতী এবং খারাপ কাজে

অগ্রবর্তী আর কোনো ফেরকা নাই।”[44] তিনি ইমামিয়াদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা বলেন।[45]

মিনহাজুস সুন্নাহ্ আননাবাওয়িয়্যাহ্ (২/৬০৭) এবং (৭/৪১৬)।

যুক্তি ও দলীল দেয়ার ক্ষেত্রে ইমামিয়াদের মূর্খতা জানতে হলে দেখুন: মিনহাজুস সুন্নাহ্ আননাবাওয়িয়্যাহ্ (৪/৬৩, ৬৪, ৬৫)।

চার ইমামের প্রতি কুরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী মাযহাব প্রবর্তনের অপবাদ

চার ইমাম ও তার অনুসারীদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বারো ইমামী শিয়া আলেম বায়াযী বলেন, "বিরোধীরা তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান গ্রহণ করেছে কিয়াস ও ইসতিহসান থেকে। আর আমরা গ্রহণ করেছি যামানার ঐ সব ইমামদের কাছ থেকে, যারা হালাল-হারামের বিধি-বিধান গ্রহণ করেছেন তাদের মহান নানার কাছ থেকে। তিনি জিব্রাইলের মাধ্যমে মহান রবের কাছ থেকে।"[46]

এছাড়াও বায়াযী একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেন এভাবে, "কিতাব ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তারা যে কিয়াসকে আঁকড়ে ধরেছে সে কিয়াস সম্পর্কে আলোচনা।" অন্য এক স্থানে সে একটা কবিতা লেখে তা হল এই-

তুমি আমার কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছ তা যদি মিথ্যা হয় তাহলে

আসসিরাতুল মুসতাকিম (৩/২০৭)।

আবু হানীফা ও যুফারের পাপও তোমার কাঁধে

যে আবু হানীফা ও যুফার 'শরীয়ত ও হাদীস'কে বাদ দিয়ে

কিয়াসের দিকে ধাবিত হয়েছে।[47]

আবার একস্থানে বলেন, "এটা হল তাদের মতানৈক্যের সাগরের একটা ছিঁটেফোটা। তারা তাদের রবের কিতাবের বরখেলাফ করেছে, নবীর সুন্নতকে বর্জন করেছে। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের আরো অনেক জঘন্য বক্তব্য আছে।"[48]

ইমামিয়া শিয়াদের আরেক আল্লামা 'ইবনে মুতাহ্হির আলহিল্লি' মিনহাজুল কারামা গ্রন্থে বলেন, "তাদের সকলে কিয়াস ও যুক্তি দিয়ে দলীল দেওয়ার পক্ষপাতী। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনে ভিন্ন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে।...এবং সাহাবীদের[49] বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"[50]

প্রাগুক্ত (৩/২১০)।

প্রাগুক্ত (৩/২০৫) এছাড়াও দেখুন (৩/১৯৫)।

[49] বস্তুত শিয়ারা সাহাবীদেরকে ঈমানদারই মনে করে না, তাদের কথার মূল্য তাদের কাছে কী-ই বা আছে। তারা আসলে এর দ্বারা তাদের কাছে বর্ণিত

মুহাম্মদ বাকের আল-মাজলিসি ইমামিয়াদের কতিপয় আলেমের কিছু বাণী উদ্ধৃত করেন। সেসব বাণীতে তারা সুন্নী আলেমদেরকে সাহাবীদের মতামতের বিপরীত সিদ্ধান্ত দেওয়ার কারণে কটাক্ষ করেন। বিশেষতঃ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর মতের বিপরীতে। যেমন একটি বাণীতে বলা হচ্ছে- "এমন কোনো ফিকহবিদ পাওয়া যাবে না যিনি কোনো না কোনো মাসয়ালাতে হলেও আমীরুল মুমিনীনের মতের বরখেলাফ করেন নি এবং তাদের মত বাদ দিয়ে অন্যের মত গ্রহণ করেন নি।"[51]

বাকের আরো বলেন, "শাফেয়ী ছাড়া তাদের আর কোনো ফিকহবিদ নেই, তাছাড়া এ শাফেয়ীও আমীরুল মুমেনীনের প্রতি দোষারোপ করেছে, তার অনেক মতামতকে হেয় করেছে এবং তার দেওয়া অনেক হুকুমকে প্রত্যাখ্যান করেছে।...যদি কারো অন্তরে তার (আলী

আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে যে সব মতামত লিখে নিয়েছে সেগুলো উদ্দেশ্য নিয়েছে। বাস্তবে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে তাদের সে বর্ণনাগুলো মোটেই শুদ্ধ নয়। [সম্পাদক]

হিল্লির 'মিনহাজুল কারামাহ্' (পৃঃ ৯৩) থেকে মিনহাজুস সুন্নাহ্তে (৩/৪০০-৪০১) উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বিহারুল আনওয়ার (১০/৪৪৪-৪৪৫)।

রাঃ) প্রতি সামান্যতম ভালোবাসাও থেকে থাকে তাহলে সে এমন করতে পারে না।[52]

বিহারুল আনওয়ার (১০/৪৪৪-৪৪৫), এছাড়া মাযহাবের ইমামরা ও তাদের অনুসারীরা কিয়াসকে গ্রহণ করার কারণে তাদের প্রতি দোষারোপ সংক্রান্ত বিষয়ে দেখুন: (২/২৮৬, ২৮৮-২৮৯),(২/২৯৮),(১০/২৩০)(বাবুল ইহতিজাজ আলাল মুখালিফীন)

এ অপবাদের জবাব

এক: ইমামরা সকলে কুরআন-সুন্নাহর বরখেলাফ করার উপর ঐক্যমত করেছেন এধরনের দাবীর পক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে আমি এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছি এবং একটু পর – ইনশাআল্লাহ্- ইমামদের আরো কিছু বাণী উল্লেখ করব যা প্রমাণ করে যে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে, কোনো হুকুম বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা কুরআন ও সুন্নাহ্কে কত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

আর সাহাবীদের মতের বরখেলাফ করার যে অভিযোগ রাফেযীরা চার ইমামের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছে সে ব্যাপারে বলতে হয়- রাফেযীরা তো সাহাবীদেরকে কাফের ও ভ্রান্ত মনে করে। তারা কিভাবে অন্যদেরকে সাহাবীদের মতের খেলাফ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে!!

এটা বড় তাজ্জব ও অদ্ভুত ব্যাপার। নিঃসন্দেহে এটা তাদের ধোঁকাবাজি ও ছলনা। “তারা ছলনা করে, আল্লাহ্ও ছলনা করেন। আল্লাহ্র ছলনা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম।” [আনফাল: ৩০]

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া বলেন, “সাহাবীদের মতের বরখেলাফ করা, তাদের সিদ্ধান্তকে বর্জন করা ইমামিয়াদের কাছে কবে খারাপ কাজ ছিল?! আর যারা সাহাবীদেরকে ভালোবাসে, তাদেরকে আপনজন মনে করে, তাদের যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ মনে করে এবং তাদের ঐকমত্যকে অকাট্য দলীল মনে করে এবং ইত্যাদি...বিষয়ে তারা সকলে একমত; তাদের প্রতি কিভাবে ইমামিয়ারা সাহাবীদের মতের খেলাফ করার অভিযোগ তোলে। যে ইমামিয়ারা সাহাবীদের ঐকমত্যকে দলীল মনে করে না, বরং সাহাবীদেরকে কাফের ও যালেম মনে করে।”[53]

দুই: বারো ইমামী শিয়া ইমামিয়াদের এ অভিযোগের মধ্যেই তো স্ববিরোধিতা। তারা একবার বলে সুন্নী ইমামরা সাহাবীদের খেলাফ করেছেন এবং এটা তাদের বড় অপরাধ। আবার তারাই সাব্যস্ত করে যে, সুন্নী ইমামদের ইলমের ভিত্তি হল সাহাবীদের ইলম।

আসুন আমরা শুনি এ ব্যাপারে ইমামিয়াদের আল্লামা এবং তাদের মাঝে তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ইবনুল মুতাহ্হির আলহিল্লি কি

মিনহাজুস সুন্নাহ্ (৩/৪০৫-৪০৬)।

বলেন। তিনি তার মিনহাজুল কারামাহ্ গ্রন্থে বলেন, “মালেক পড়েছেন রবী‘আ’র[54] কাছে, আর রবী‘আ’ পড়েছেন ইকরিমার[55] কাছে, ইকরিমা পড়েছেন ইবনে আব্বাসের কাছে, আর ইবনে আব্বাস তো আলীর ছাত্র[56] ছিলেন।”[57]

তাকে বলা হয় রাবীআ’তুর রায়।

তিনি হচ্ছেন ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস ‘ইকরিমা’। তিনি ছিলেন তাবেয়ী এবং মক্কার ফকীহদের অন্যতম। তার মূল বংশ বারবারী। হাদীয়া হিসেবে তিনি ইবনে আব্বাসের কাছে আগত হয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাকে আলেম বানান এবং ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দেন। তার মৃত্যুর সাল ১০৪ হিঃ, মতান্তরে ১০৫ হিঃ, মতান্তরে ১০৬ হিজরী। [আশ শাজারাত (১/১৩০]

এটা ইমামিয়াদের মিথ্যাচারের একটি। ইবনে তাইমিয়া ‘আল মিনহাজে’ বলেন, “ইবনে আব্বাস আলীর (রাঃ) ছাত্র ছিলেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা। কারণ আলী (রাঃ) থেকে ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েত একেবারে কম। তার অধিকাংশ রেওয়ায়েত হচ্ছে- উমর, যায়েদ ইবন সাবেত ও আবু হুরায়রা প্রমুখ সাহাবী (রাঃ) থেকে।”

‘মিনহাজুল কারামাহ্’ (পৃষ্ঠা: ১৭৯), মাধ্যম রেফারেন্স: মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাওয়িয়্যিাহর (পৃষ্ঠা: ৭/৫৩৫)।

এর কয়েক পৃষ্ঠা আগে বলেন, “ফিকহবিদ সবার রেফারেন্স হলেন তিনি”[58] উদ্দেশ্য হচ্ছে –আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু।

প্রকৃতপক্ষে এ সকল ফিকহের ইমামদের ইলম ও ফিকহের উৎস হল সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ইলম ও ফিকহ। ইমাম আবু হানীফার রাহিমাহুল্লাহ ইলম ও ফিকহের খাস ওস্তাদ ছিলেন হাম্মাদ ইবন আবী সুলাইমান। হাম্মাদ ছিলেন নাখ‘য়ীর[59] ছাত্র। নাখ‘য়ী ছিলেন আলকামার[60] ছাত্র। আলকামা ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছাত্র।

মিনহাজুল কারামাহ্’ (পৃষ্ঠা: ১৭৮) মাধ্যম রেফারেন্স: মিনহাজুস সুন্নাহ আননাবাওয়িয়্যিয়্যাহর (পৃষ্ঠা: ৭/৫২৯)।

তিনি হচ্ছেন- ইব্রাহীম ইবন ইয়াযিদ আননাখায়ী’, তার উপনাম: আবু ইমরান (ইমরানের বাবা)। মহান ইমাম, ইরাকের ফকীহ। তিনি মাসরুক, আলআসওয়াদ ও আলকামার ছাত্র ছিলেন। মৃত্যু: ৯৫ হিঃ। [আশ শাজারাত (১/১১১)]

তিনি হচ্ছেন- আলকামা ইবন কায়স আননাখায়ী আলকুফী; ফিকাহবিদ। তিনি ইবনে মাসউদের (রাঃ) ছাত্র ছিলেন এবং তাকে ইবনে মাসউদের (রাঃ) সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হত। একাধিক সাহাবী তার কাছ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করেছেন। মৃত্যু: ৬২ হিঃ। [আশ শাজারাত (১/৭০)]

মালেকের কথা সবাই জানে, তিনি ইলম গ্রহণ করেছেন মদীনার আলেমদের কাছ থেকে, যারা প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহর[61] কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন। যে ফকীহরা যায়েদ ইবন সাবেত, আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর প্রমুখ সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ মক্কার আলেমদের কাছ থেকে ফিকহের ইলম গ্রহণ করেছেন। যারা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ছাত্রদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন এবং তিনি পরবর্তীতে মালেকের কাছ থেকেও ইলম গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমাদ ছিলেন হাদীসবিশারদদের মতাদর্শের উপরে। তিনি ইলম গ্রহণ করেছেন সুফিয়ান ইবন 'উয়াইনা ও আমর ইবন দিনারের[62] কাছ থেকে এবং এ দুজন ইলম গ্রহণ করেছেন ইবনে

সে সাতজন ফকীহ হচ্ছেন- সাঈদ ইবন আলমুসাইয়্যেব, উরউয়া ইবন আয-যুবাইর, খারিজা ইবন যায়েদ, আল-কাসেম ইবন মুহাম্মদ, আবু বকর ইবন আব্দুর রহমান, সুলাইমান ইবন ইয়াসার, উবাইদুল্লাহ্ ইবন আব্দুল্লাহ্ ইবন উতবাহ্ ইবন মাসউদ। [দেখুন: ইবনুল কাইয়্যেমের ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন' (১/২৩)]

তিনি হচ্ছেন- আমর ইবন দিনার, তার উপনাম হচ্ছে: আবু মুহাম্মদ (মুহাম্মদের পিতা)। তিনি আলজামহী গোত্রের আযাদকৃত দাস ছিলেন। ইয়ামেনের

আব্বাস, ইবনে উমর ও অন্যান্য সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কাছ থেকে।[63]

অতএব এ ধরনের ব্যক্তিবর্গকে সাহাবীদের সাথে খেলাফ করার অভিযোগ অভিযুক্ত করাকে কার বিবেকে সায় দিবে?

তিন: তাদের আরেকটি অভিযোগ হল যে, সুন্নী মাযহাবের ইমামরা আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর দেওয়া কিছু কিছু ফতোয়া ও হুকুমের সাথে দ্বিমত করেছেন। আমরা বলব, কোনো একটা মাসয়ালায় একজন সাহাবীর সাথে দ্বিমত করা এবং এর বিপরীতে অধিকাংশ সাহাবীর সাথে একমত হওয়া অবান্তর কিছু নয়। বিশেষতঃ এ দ্বিমত যদি কুরআন-সুন্নাহ নির্ভর সঠিক নীতিমালার আলোকে হয়ে থাকে। কারণ সঠিক মতানুযায়ী কোনো সাহাবীর সাথে যদি অপরাপর সাহাবীরা দ্বিমত পোষণ করেন তাহলে

ছানয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ইবনে আব্বাস ও জাবের (রাঃ) থেকে হাদীস শুনেছেন। শু‘বা বলেন: “হাদীস শাস্ত্রে আমি তার চেয়ে মজবুত কাউকে দেখিনি”। ১২৬ হিজরীতে তিনি মক্কাতে মারা যান। [আশ শাজারাত (১/১৭১)]

দেখুন: মিনহাজুস সুন্নাহ্ (৭/৫২৯-৫৩০), ই’লামুল মুওয়াক্কিয়ীন (১/২৩)।

ঐ সাহাবীর কথা অকাট্য দলীল হবে না। এটাই উসুলুল ফিকহের সিদ্ধান্ত।[64]

এ ক্ষেত্রে যে খেলাফ বর্ণনা করা হয় তা ঐ ক্ষেত্রে যদি কোন সাহাবীর মতের বিপক্ষে অন্য কোন সাহাবীর মত আছে বলে জানা না যায়। মুহাম্মদ আমীন আশ শানকিতী তার 'মুযাক্কিরা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা: ১৬৪) এ কথাকেই সাব্যস্ত করেছেন। দেখুন: 'মারাকিস ছু-উদ ইলা মারাকিস সু-উদ', লেখক: মুহাম্মদ আলআমীন ইবন আহমাদ আলজিনকী (পৃঃ ৪০১), তাহকীক: মুহাম্মদ মুখতার আশশানকিতী, এছাড়াও দেখুন: শায়খুল ইসলামের 'মাজমুউ ফাতাওয়া' (১/২৮৩-২৮৪)।

তাদের আরেকটি অপবাদ হলো,

শাসকগোষ্ঠীর কুপ্রবৃত্তি অনুযায়ী

চার মাযহাব তার গতি পরিবর্তন করে

যে ইমামিয়ারা এই অপবাদটি আরোপ করে তাদের একজন হল হাশেম মারুফ আল-হুসাইনী।[65] তিনি বলেন, "চার মাযহাবের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এই আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই ফুটে উঠে যে, যেসব কারণে এ মাযহাবগুলো বিস্তার লাভ করেছে এবং স্থায়িত্ব পেয়েছে তার মধ্যে প্রধান কারণ হল - এই মাযহাবগুলো জন্ম লাভ করার পর হতে নিকট অতীত পর্যন্ত সময় অবধি সবসময় শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ছিল।"[66]

বার-ইমামের মতাবলম্বী সমকালীন শিয়া লেখক। তার লিখিত গ্রন্থের নাম হচ্ছে- 'আল মাবাদিউল আ-স্মাহ্ ফিল ফিকহিল জা'ফারী'।

'আল মাবাদিউল আ-স্মাহ্ ফিল ফিকহিল জা'ফারী' লেখক: হাশেম আলহুসাইনী, (পৃঃ ৩৮৫)।

বার-ইমামী অনুসারী আরেক শিয়া মুরতাজা আল-আসকারী[67] বলেন, “অতঃপর শাসকরা যে মাযহাবকে সমর্থন দিয়ে আইন হিসেবে গ্রহণ করত সে অনুযায়ী আমল চলত এবং সেটাই আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের মর্যাদা পেত। আর ভিন্নমত পোষনকারী ও তার মতকে ছুড়ে ফেলা হত...এমনকি শেষ পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী ফিকহের চার মাযহাবের মধ্য থেকে কোনো একটি মাযহাবকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে অট্টহাসি হাসত।...স্বভাবতঃ জনগণ শাসকদের ধর্মের অনুগত হয়ে থাকে। এ কারণে সাধারণ মানুষ তাদের শাসকের মাধ্যমে বাস্তবে যেটাকে ইসলাম হিসাবে দেখল সেটাকে গ্রহণ করল এবং শাসকরা যেসব হুকুম-আহকাম, আকীদা-বিশ্বাস ও হাদীসকে সমর্থন দিল সেগুলোকেই মেনে নিল। এভাবে শাসকদের অনুসারীরা আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ খেতাব পেল।”[68]

সমকালীন ইমামিয়া শিয়াদের একজন। ১৩৯১ হিঃ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ‘খামসুনা ওয়া মিআতু সাহাবী মুখতালাক’ নামক গ্রন্থের লেখক এবং বাগদাদের ‘কুল্লিয়াতু উসুলুদ দ্বীন (আল ইমামিয়া) এর প্রতিষ্ঠাতা। দেখুন: তার কিতাবের ভূমিকা ‘‘খামসুনা ওয়া মিআতু সাহাবী মুখতালাক’ (পৃঃ ১৯)এবং ‘আসলুশ শিয়া ওয়া উসুলুহা’ (পৃঃ ৬৩)।

‘আসলুশ শিয়া ওয়া উসুলুহা’ গ্রন্থের ভূমিকা (পৃঃ ৫৯-৬০)।

মোটকথা: গোঁড়াপন্থী এই দুই শিয়া যা বলল কোনো শিয়ার মুখে এ ধরনের কথা বেমানান নয়। কারণ তারা তাদের ইমামদেরকে বিদ্রোহী নেতা মনে করে এবং তাদের ধর্মকে বিদ্রোহী ধর্ম মনে করে। তারা মনে করে, স্থান-কালের ভেদাভেদ ছাড়া কেবল শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মাধ্যমেই তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে।[69]

হুসাইন আলে উসফুর বলেন, ‘‘যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমীরুল মুমেনীন ‘আলাইহিস সালাম এর কাছে ক্ষমতা আসল তখন তিনি তাদের প্রণীত অনেকগুলো বিদ‘আতী নীতিমালাকে পরিবর্তন করে দিলেন। কিন্তু তারপরও অনেকগুলো থেকে গেছে। সেগুলোকে তিনি পরিবর্তন করতে পারেন নি। কারণ সেসময় বিরোধীর সংখ্যা ছিল বেশী। এরপর যখন উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন তারা জঘন্য বিদআতের আগুন জ্বালাল। বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করে

পাঠক এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাইলে তাদের নিম্নোক্ত বইগুলো পড়তে পারেন- মুহাম্মদ মাহদী শামসুদ্দীনের ‘ছাওরাতুল হুসাইন’, মুহাম্মদ জাওয়াদ মুগান্নিয়ার ‘আশ শিয়া ওয়াল হাকেমুন’, ড. মুসা আলমুসাবির ‘আছ ছাওরা আল বায়িসা’।

ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতি তৈরী করল। তারা ঐসব নীতিমালার মধ্যে নতুন নতুন সংযোজন করতে থাকল এবং পূর্ববর্তীরা যে পথ রচনা করে গিয়েছিল তারাও সে পথে অগ্রসর হল। এভাবে তারা গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল। ফলে মানুষ আর সঠিক পথ খুঁজে পেল না। এভাবেই চলতে থাকল। এক পর্যায়ে ক্ষমতার চাবিকাঠি বনী আব্বাসের হাতে হস্তান্তরিত হয়। যারা ছিল বাঁদী-দাসী, গান-বাজনা ও শরাবপ্রেমী।

তাদের শাসনামলে সাধারণ মানুষের চেয়ে ফিকহবিদদের সংখ্যা বেড়ে যায়। তারা ফিকহবিদদের অতি কদর করা শুরু করে এবং মানুষকে নির্দেশ দেয় যে, তাদের কাছ থেকে ফতোয়া গ্রহণ করতে। তাদের কাছে বেশী মূল্যায়ন পেত সেসব ফকীহরা, যারা রাসূলের বংশধরদের প্রতি বেশী বিদ্বেষ পোষণ করত এবং আকীদা-বিশ্বাস ও মাসয়ালা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের সাথে বেশী খেলাফ করত। সে যুগে অনেক বড় বড় ফকীহ ছিল। তদুপরি আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ ইবন হাম্বল এবং তাদের মাযহাবের অনুসারীরা তাদের কাছে বেশী কদর পেত। যেহেতু তারা ছিল আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষপোষণ ও জুলুম করার জন্য প্রসিদ্ধ।

এছাড়া যেহেতু ইবলিসের প্ররোচনায় তারা মানুষকে প্রতারিত করার পথ বেছে নিয়েছিল। বাহ্যতঃ তারা মানুষকে দেখাত যে, তারা দুনিয়াবিরাগী, শাসকদের থেকে দূরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দুনিয়া পাওয়ার জন্য এবং তাদের আদর্শের প্রতি মানুষকে ঝুঁকানোর জন্য এসব করত। যেহেতু বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার প্রতি অনীহা না দেখালে আসলে দুনিয়া পাওয়া যায় না। এভাবে তারা সেসব মানুষের মন ও মগজ আকর্ষণ করতে সক্ষম হল যারা ছিল আসলে পশুর তুল্য, বিবেকহীন। একদল মানুষ তাদের পণ্যকে বাজারজাত করল এবং তারা দ্বীনের মধ্যে যেসব নতুন বিষয়ের উদ্ভব করেছিল নানা ব্যাখ্যা ও সংস্কারের কথা বলে তারা সেগুলোকে ধামাচাপা দিয়ে রাখল।”[70]

তাদের আরেক আলেম মুহাম্মদ আত-তিজানী তার ‘ছুম্মাহতাদাইতু’ কিতাবে বলেন, “চার মাযহাবের মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে।

শায়খ হুসাইন আলু উসফুর আদদারাযি আল বাহরাইনীর ‘আলমাহাসিন আননাফসিয়্যাহ্ ফি আজওবিয়াতিল মাসায়িল আল খুরাসানিয়্যাহ্’। (পৃঃ ১২), জমইয়্যাতু আহলিল বাইত কর্তৃক ‘আল মাশরিক আল আরাবী আলকাবীর’ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৩৯৯ হিঃ।

সুতরাং এই মাযহাবগুলো আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পক্ষ থেকে নয়।”[71]

তার অন্য একটি কিতাব ‘আশ শিয়া হুম আহলুস সুন্নাহ’ তে বলেন, “এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শাসকগোষ্ঠী যে মাযহাবগুলোর উদ্ভাবন করেছে এবং সেগুলোর নাম দিয়েছে ‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ্’, সে মাযহাবগুলো কিভাবে প্রসার লাভ করেছে... এরপরে আরেকস্থানে গিয়ে বলেন, এই গবেষণাতে আমাদের উদ্দেশ্য হল দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত করা যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মাযহাবগুলো রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট।”[72]

এ অপবাদের সংক্ষিপ্ত জবাব

এ কথা জোর তাকিদ দিয়ে বলা যায় যে, সুন্নী চার ইমাম কখনো শাসকগোষ্ঠীর তাবেদার ছিলেন না। অতএব তাদের ফতোয়া শাসকগোষ্ঠীর কুপ্রবৃত্তি মোতাবেক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং

ছুম্মাহতাদাইতু, লেখক: ড. মুহাম্মদ আততিজানী (পৃঃ ১২৭)।

‘আশ শিয়া হুম আহলুস সুন্নাহ্’ লেখক: ড. তিজানী (পৃঃ ১০৪-১০৯)।

শাসকদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। চাই কোনো শাসক ন্যায়পরায়ন হোক অথবা জালেম হোক। শরীয়তের দলীল-প্রমাণ যা দাবী করে তারা শাসকদের সাথে সে রকম আচরণ করতেন। যদি বারো-ইমামী শিয়াদের দাবীটা সঠিক হত তাহলে বিচারকের পদ না নেওয়ার কারণে ইমাম আবু হানীফাকে কি প্রহার করা হত এবং মৃত্যু পর্যন্ত জেলে আটক করে রাখা হত?![73] শুধু একটা ফতোয়ার কারণে ইমাম মালেককে কি প্রহার করা হত এবং মদীনার আনাচে-কানাচে তাকে ঘুরানো হত?![74] অথবা 'কুরআন সৃষ্ট নয়' এ কথা বলার কারণে কি ইমাম আহমাদকে এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হত?![75] যদি ইমামিয়াদের মধ্যে কোনো বিবেকবান মানুষ থাকে তবে তারা এসব প্রশ্নের জবাব দিক।

এই ঘটনাটি দেখুন: 'তারীখু বাগদাদ (১৩/৩২৪, ৩২৮) এবং আল ইনতিকা (পৃঃ ১৭১)।

এই ঘটনাটি দেখুন: 'আল ইনতিকা (পৃঃ ৪৩-৪৪) এবং শাজারাতুয যাহাব (১/২৯০)।

এই ঘটনাটি দেখুন: আবু নুআইমের 'হিলয়াতুল আউলিয়া' (৯/১৯৫-২০৪) এবং ইবনে কাছীরের 'আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া' (১৪/৩৯৩-৪০৫)।

তারা সুন্নী ইমামদের আরো যে সব দোষ বর্ণনা করেন তাহলো-

“সুন্নীদের উক্ত চার ইমাম শাসকদের দোষত্রুটি জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন না, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন না বা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতেন না, ইত্যাদি’

(এর জবাব হচ্ছে) ইমামরা কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে অথবা ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা আদায়ে অথবা সামষ্টিক কোনো স্বার্থ রক্ষার্থে এ ধরনের অবস্থান নেন নি। বরং তাদের এ ধরনের অবস্থান ছিল এজন্য যেন উম্মতের মাঝে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না হয় এবং মুসলিমদের জামায়াতে কোনো বিছিন্নতা তৈরী না হয়। আর এটাই রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ্‌র দাবী, যে সুন্নাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা ইমামিয়া শিয়ারা সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ!!

এখানে আমরা কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করব যে রেওয়ায়েতগুলো প্রমাণ করে যে, ইমামরা যে অবস্থান নিয়েছিলেন সেটাই সঠিক অবস্থান:

বুখারী ও মুসলিমে উবাদা ইবন সামেত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বায়‘আতের

আহ্বান জানালেন তখন আমরা তার হাতে বায়'আত করলাম। তিনি আমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিলেন তার মধ্যে এটাও ছিল যে, 'পছন্দ হোক বা না হোক, সুবিধা হোক অথবা অসুবিধা হোক, এমনকি অধিকার বঞ্চিত হলেও আমরা (শাসকের) কথা শুনব, তার আনুগত্য করব এবং শাসকের সাথে ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি করব না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মাঝে সুস্পষ্ট কোনো কুফরী পাওয়া না যায়। যে-কুফরী কুফরী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোনো দলীল আছে।'[76]

অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তিনটি গুণ থাকলে কোনো মুসলিমের অন্তর সেগুলোকে বিদ্বেষ, ঘৃণা কিংবা অপছন্দ করতে পারে না।[77] আমলে আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠতা, শাসকবর্গের কল্যাণ কামনা করা এবং মুসলিমদের জামা'আতকে

হাদীসটি ইমাম বোখারী (৬৬৪৭) ও মুসলিম (১৭০৯) বর্ণনা করেন।

[77] বরং তা গ্রহণ করে নেয়, তাই হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা বা অপছন্দ সেখানে স্থান পায় না। [সম্পাদক]

আঁকড়ে থাকা। কেননা মুসলিমদের দো‘আ এর চারপাশকে ঘিরে আবর্তমান।”[78]

আউফ ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, সাবধান! জেনে রাখো, কারো উপর যখন কেউ নেতা হয়ে আসে, অতঃপর সে নেতাকে কোনো গুনাহর কাজ করতে দেখে তার উচিত ঐ গুনাহকে অপছন্দ করা। কিন্তু তারপরও তার আনুগত্য করে যাওয়া। আনুগত্যের হস্ত তুলে না নেওয়া।”[79]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “তোমার জন্য কঠিন হোক অথবা সহজ হোক, তোমার কাছে ভাল লাগুক বা না

হাদীসটি বর্ণনা করেন তিরমিযী তার জামে’ গ্রন্থে (২৬৫৮), ইবনে মাজাহ্ তার সুনান গ্রন্থে (২৩০), আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে (১৩৩৭৪, ২১৬৩০), ইবনে আবী আসেম তার সুন্নাত (১/৯৪) নামক গ্রন্থে; শেষোক্ত গ্রন্থের মুহাক্কিক বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। এছাড়াও ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে (৬৭, ৬৮০)।

হাদীসটি বর্ণনা করেন ইমাম আহমাদ তার গ্রন্থে (২৪০২৭), মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে (১৮৫৫) এবং ইবনে আবী আসেম তার সুন্নাত নামক গ্রন্থে (২/৭২১-৭২২)।

লাগুক, এমনকি তোমার প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নিলেও নেতার কথা শুনা এবং তার আনুগত্য করা তোমার উপর ফরয।”[80]

অন্য এক শব্দে এসেছে- “যদি তারা তোমার মাল কুক্ষিগত করে এবং মারতে মারতে তোমার পিঠ বাঁকা করে ফেলে তবুও।”[81]

এ ব্যাপারে সাহাবীদের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমগণের বাণী

আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বড় বড় সাহাবীরা সাবধান করতে গিয়ে বলেন, ‘তোমরা তোমাদের শাসকদেরকে গালি দিবে না, তাদের সাথে প্রতারণা করবে না,

---

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে (১৮৩৬) আবু হুরাইরা (রাঃ) এর সনদে এবং ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে উবাদা ইবন ছামেত (রাঃ) এর সনদে উল্লেখ করেন।

হাদীসটি ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে (৪৫৬২, ৪৫৬৬) উবাদা ইবন সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য্য ধারন কর। আল্লাহ্‌র ফয়সালা বেশী দূরে নয়।"[82]

সুন্নী চার ইমামের প্রতি বারো ইমামী শিয়াদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার পর এবার ইমামদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আলাদা আলাদাভাবে তাদের যেসব অভিযোগ সে বিষয়ে আলোকপাত করব।

ইবনে আবী আসেম তার সুন্নাত নামক গ্রন্থে (২/৬৯৩) এই আসারটি উল্লেখ করেন। মুহাক্কিক বলেন: এই বর্ণনাটির সনদ হাসান।

ইমাম আবু হানীফার রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়াদের অপবাদ

তারা ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে যে, তিনি হাদীস জাল করাকে জায়েয বলেছেন।[83]

এই মহান ইমামের ইলম, তার দ্বীনদারী, পরহেজগারী এবং আলেমদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তাদের এই অপবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট। হাদীস দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে কথা বলা আর হাদীস জাল করাকে জায়েয বলা দুটো এক জিনিস নয়। পাঠক এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন!!

কুলাইনী তার কাফী নামক গ্রন্থে সামা'আহ ইবন মেহরান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাদের সপ্তম নিষ্পাপ ইমাম আবুল হাসান মূসা 'আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "কেউ যদি তোমাদেরকে এমন হাদীস শুনায় যা তোমরা জান তাহলে তা গ্রহণ কর। আর কেউ যদি এমন কোনো হাদীস শুনায় যা তোমরা জান না, তাহলে সে হাদীস হল এই - তিনি হাত দিয়ে মুখের দিকে ইশারা করলেন- (অর্থাৎ তিনি বুঝাতে চাইলেন সে হাদীস মিথ্যা)। অতঃপর

দেখুন: 'আসসিরাতুল মুসতাকীম' (৩/২১৩)।

বললেন, *আবু হানীফার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হোক*। সে বলত, আলী 'আলাইহিস সালাম এই মত পোষণ করেন। আর আমি ও অন্যান্য সাহাবীরা এই মত পোষণ করি।"[84]

মুহাম্মদ ইবন আমর আল কাশ্‌শি তার 'ইখতিয়ারু মারিফাতিল রিজাল' গ্রন্থে বলেন, যে গ্রন্থটি 'রিজালুল কাশশি' নামে পরিচিত "হারুন ইবন খারিজা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ 'আলাইহিস সালামকে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত হয় নি'[সূরা আনআম: ৮২] আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, তা (অর্থাৎ আয়াতে যুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য) হল আবু হানীফা ও যুরারা যা কিছুকে ওয়াজিব বলেছেন সেসব বিষয়।"[85]

অন্য এক রেওয়ায়েতে আবু বুসাইর আবু আব্দুল্লাহ্‌ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (বুসাইর) বললেন, আমি বললাম, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুম মিশ্রিত হয় নি'[সূরা আনআম:

দেখুন: কুলাইনীর 'আলকাফী' (১/৫৮)।

'রিজালুল কিশ্‌শি' (পৃঃ ১৪৯)।

৮২]। তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাকে সে যুলুম থেকে হেফাজত করুন। *আমি বললাম, সে যুলুমটা কি? তিনি বললেন, যুরারা ও আবু হানীফা যা কিছু উদ্ভাবন করেছে তা।*”[৮৬]

অনুরূপভাবে তীজানী বলেন, “আমরা দেখতে পাই- *আবু হানীফা একটি বিদ‘আতী মাযহাব চালু করেছে,* যে মাযহাব শরীয়তের স্পষ্ট দলীলের বিপরীতে কিয়াস এবং যুক্তির উপর নির্ভরশীল।”[87]

বস্তুত এ সকল অভিযোগ অবান্তর, অগ্রহণযোগ্য। কারণ আবু হানীফা যে সুন্নতের অনুসারী ইমাম, হক্কপন্থী, হেদায়াতের বাহক এর সপক্ষে অসংখ্য মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তিনি এমন ইলম রেখে গেছেন বড় বড় ব্যক্তিরাও যে ইলম বহন করার যোগ্যতা রাখেন না।

ইমামিয়া শিয়া আলেম ইউসুফ আল-বাহরাইনী এই মহান ইমামের বিরুদ্ধে তার সুপ্ত বিদ্বেষ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, “প্রথম শাহ্ আব্বাস যখন বাগদাদ বিজয় করেন তখন তিনি আবু হানীফার

‘রিজালুল কাশশি’ (পৃঃ ১৪৫)।

‘আশ শিয়া হুম আহলুস সুন্নাহ্’ (পৃঃ ৮৮) লেখক: ড. মুহাম্মদ আত তীজানী।

কবরকে টয়লেট বানানোর নির্দেশ দেন। যে কেউ মল ত্যাগ করার জন্য আবু হানীফার কবরে চলে যেত। এছাড়া আবু হানীফা যে দুটি অচল দিরহাম ওয়াক্‌ফ করে গিয়েছেন সে দুটি দিরহামকে বাজারের মুখে লটকিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। একদিন বাদশাহ কবরের খাদেমকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কবরের মধ্যে কার খেদমত কর? আবু হানীফা তো এখন জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তরে আছে। সে বলল, আপনার দাদা শাহ্ ঈসমাইল যখন বাগদাদ দখল করেন তখন এই কবর থেকে আবু হানীফার হাড্ডিগুড্ডি বের করে সেস্থানে একটা কুকুরকে দাফন করেছিল। আমি ঐ কুকরের খেদমত করি। তার কথা সত্য ছিল। কারণ মরহুম শাহ্ ঈসমাইল বাস্তবিকই এমনটি করেছিলেন।

তার (আবু হানীফার) একটা কারামত হল: বাগদাদের বাদশাহ্ একবার সুন্নী আলেম ও আবেদদেরকে ডেকে বললেন, কি ব্যাপার এই অন্ধ লোকটি মুসা ইবন জাফরের মাজারের গম্বুজের নীচে এক রাত্রি যাপন করে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। আবু হানীফাকে ইমামে আযম বলা হয়, কিন্তু আমরা তার ব্যাপারে এ রকম কোনো কারামতের কথা শুনি না কেন?

তখন উপস্থিত লোকেরা জবাব দিল যে, আবু হানীফার বরকতেও এ রকম ঘটনা ঘটতে পারে। বাদশাহ্ বলল, তাহলে আমি এ রকম একটা কারামত দেখতে চাই যেন আমি দ্বীনের ব্যাপারে স্পষ্ট জ্ঞান নিতে পারি। তখন তারা একজন গরীব লোকের কাছে এসে বলল, আমরা তোমাকে এত এত দিরহাম ও দিনার দিব। তুমি বলবে যে, আমি অন্ধ। লাঠি ঠেঁক দিয়ে দুই-তিন দিন তুমি হাঁটবে। এরপর জুমা'র রাত্রিতে আবু হানীফার কবরের কাছে গিয়ে রাত্রিযাপন করবে। সকাল হলে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ্, এই কবরওয়ালার বরকতে আমি নিরাময় লাভ করেছি। সে তাদের কথামত ঐ রাত্রিটি আবু হানীফার মাজারের গম্বুজের নীচে যাপন করল। যখন সকাল হল সে লোকটি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেল। তখন সে চিৎকার করে বলল, ও লোকেরা তোমরা শুন, এরকম এরকম আমার কাহিনী। আমি পেশাজীবি মানুষ, আমার পরিবার-পরিজন আছে। এভাবে তার খবর বাদশাহর কানেও গেল। তখন বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার কাছে তাদের দুরভিসন্ধির কথা শুনলেন। এরপর বাদশাহ

তাদেরকে বাধ্য করলেন আজীবন সে লোকটার জীবিকার ব্যবস্থা করতে।”[৪৪]

ইউসুফ আল বাহরাইনীর ‘আলকাশকুল’ গ্রন্থের (১/৩৫১); বৈরুতের আল হেলাল লাইব্রেরী; প্রথম সংস্করণ।

এ ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাচার। এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। শিয়ারা আহলে সুন্নাতের ইমামদের নিয়ে খারাপ ঘটনা বানিয়ে তাদের হিংসা চরিতার্থ করে থাকে। তাই এসব ঘটনার জবাব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। [সম্পাদক]

ইমাম মালেকের রাহিমাহুল্লাহ উপর ইমামিয়াদের অপবাদ

বায়াযীর আসসিরাতুল মুসতাকীম গ্রন্থে এসেছে, জাফর ইবন আবি সুলাইমান ইমাম মালেককে প্রহার করেন এবং চুল কামিয়ে তাকে উটের পিঠে করে ঘুরান। আরো বর্ণনা করেন যে, তিনি (ইমাম মালেক) খারেজীদের মত পোষণ করতেন। তাকে খারেজীদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এমন কওম সম্পর্কে আমি কী বলব যারা আমাদের উপর ক্ষমতাসীন হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছে?[89]

তিজানী বলেন, "*এই মালেক ইসলাম ধর্মের মধ্যে একটি বিদ'আতী মাযহাব চালু করেছে।*"[90]

এগুলো সুস্পষ্ট অন্যায় অপবাদ। বরং ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ সুন্নতের অনুসারী ইমাম এবং বিদ'আত বিরোধী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ইমাম মালেকের রাহিমাহুল্লাহ ইলম, সুন্নাহ্ সম্পর্কে তার জ্ঞান এসব অভিযোগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

দেখুন: 'আসসিরাতুল মুসতাকীম' (৩/২২০)।

ড. মুহাম্মদ আত তীজানীর 'আশ শিয়া হুম আহলুস সুন্নাহ্' (পৃঃ ৮৮)।

ইমাম শাফেয়ীর রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়াদের অপবাদ

এই ফেরকাবাজদের নিকট ইমাম শাফেয়ী জারজ সন্তান!!

শিয়া আলেম ইউসুফ বাহরাইনীর কাশকুল গ্রন্থে বলা হয়, "উল্লেখিত ব্যক্তি তার উল্লেখিত গ্রন্থে তাদের কিছু আলেম থেকে বর্ণনা করেন যে, শাফেয়ীর বাবা চার বছর শাফেয়ীর মার কাছ থেকে দূরে ছিলেন। চার বছর পরে এসে দেখলেন যে, তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। এরপর শাফেয়ীর মা শাফেয়ীকে প্রসব করলেন। পরবর্তীতে শাফেয়ী যখন ইলম ও পদমর্যাদার দিক থেকে এই পর্যায়ে পৌঁছেন এবং নিজের ব্যাপারে এই ঘটনা অবগত হন তখন এই মত গ্রহণ করেন।

তাদের কোনো কোনো প্রাজ্ঞ আলেম এই ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যেহেতু আবু হানীফা জীবিত ছিলেন তাই শাফেয়ী চার বছর মায়ের পেটে আত্মগোপন করে থাকেন। যখন আবু হানীফার মৃত্যুর কথা জানতে পারেন তখন এ জগতে বের হন। যেন দুই ইমামের সম্মিলন না ঘটে। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। একটু লক্ষ্য করে দেখুন, কী মুবারকময় এই নবজাতক! কেমন সতী এই মহিলা! কিভাবে এই শিশুটাকে তার স্বামীর বলে চালিয়ে দিল!

যে কারণটা উল্লেখ করা হল তাও বা কেমন! তাদের মাযহাবের একজন ইমামের ব্যাপারে কিভাবে তারা এমন একটা খোঁড়া কারণ মেনে নিতে পারল!”[91]

ইমামিয়াদের স্ববিরোধিতার একটা দৃষ্টান্ত হল তারা ইমাম শাফেয়ীকে শিয়া ও রাফেযী বলে অভিহিত করেন!!

এ ব্যাপারে ফাহরাসাত কিতাবের লেখক ইবনে নাদিম[92] বলেন, “শাফেয়ী ছিলেন কট্টর শিয়া। একবার এক ব্যক্তি তাকে একটা মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জবাব দেন। তখন লোকটি বলল, আপনি আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মতের

ইউসুফ আল বাহরাইনীর ‘আলকাশকুল’ গ্রন্থের পৃ: (৩/৪৬); আল হেলাল লাইব্রেরী, বৈরুত; প্রথম সংস্করণ।

তিনি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আননাদীম আল-ওয়াররাক। ‘ফাহরাসাতু উলামা’ গ্রন্থের লেখক। ইবনে হাজার তার ব্যাপারে বলেন, “তিনি নির্ভরযোগ্য কেউ নন। তার উল্লেখিত গ্রন্থটি প্রমাণ করে যে, তার মাঝে মুতাযিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।...আমি তার কিতাবটি পড়তে গিয়ে আমার মনে হয়েছে- সে রাফেজী, মুতাযিলি। এছাড়া সে আহলে সুন্নাহকে ‘হাশাউয়িয়্যাহ্’ নাম দিয়ে কটাক্ষ করেছে। (মৃঃ ৪৩৮) [লিসানুল মিযান (৫/৭২), মুজামুল মুআল্লিফীন (৯/৪১)।

খেলাফ করলেন। তিনি বললেন, পারলে তুমি আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে তা সাব্যস্ত কর। তাহলে আমি আমার গাল মাটিতে রেখে বলব, আমি ভুল করেছি এবং আমি আমার মত ত্যাগ করে তার মত গ্রহণ করব।”[93]

ইমামিয়াদের জনৈক ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে কতগুলো পংক্তি বানিয়ে ইমাম শাফেয়ীর কবিতার পংক্তির সাথে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে: ইমাম শাফেয়ী তার কবিতাতে বলেছেন,

“ও আরোহী, মীনা থেকে যাওয়ার সময় তুমি মুহাস্সাবে একটু বিরতি কর সেখানকার খাইফের অধিবাসী ও চলমান লোকদের কানে কানে বলো,

এবং ঊষাকালে যখন মীনার উদ্দেশ্যে সমুদ্রের উর্মিমালার ন্যায় মানুষের ঢল নামে তখন তুমি খাইফে অবস্থানরত ও দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মাঝে ঘোষণা করে দাও,

---

ইবনে নাদীমের ‘আলফাহরাসত’ (পৃঃ ২৯৫), হিজরী ১৩৯৮ মোতাবেক ১৯৭৮ খ্রিঃ এর সংস্করণ।

মুহাম্মদের বংশধরদের ভালোবাসা যদি রাফেযীবাদ হয়, তাহলে জ্বিন-ইনসান সাক্ষী থাকুক আমি রাফেযী।”[94]

আর বারো ইমামী এক শিয়া এই পংক্তিগুলোর সাথে আরো যে পংক্তিগুলো সংযোজন করেছে সেগুলো হল-

“দাঁড়াও এবং ঘোষণা দাও যে, আমি মুহাম্মদ (সাঃ), তাঁর ওসিয়তকৃত প্রতিনিধি ও তাঁর সন্তানদের প্রতি বিদ্বেষী নই।

তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি ঐ দলের লোক যারা আহলে বাইতের মিত্রতা ভঙ্গকারী নয়।

বলে দাও যে, তোমরা আলীর উপর অন্যদেরকে যে প্রাধান্য দিয়েছ এর প্রতি ইবনে ইদ্রিস সন্তুষ্ট নয়।”[95]

‘দিওয়ানুশ শাফেয়ী’ সংকলক: ড. মুহাম্মদ যাহদী ইয়াকুন (পৃঃ ৯০-৯১) এবং ‘শি’রুশ শাফেয়ী’ সংকলক: ড. মুজাহিদ মুস্তফা বাহজাত (পৃঃ ১৪৯)।

দেখুন: দেহলাবীর ‘আততুহফা আলইসনা আশারিয়া’ (ق৬১/ب) এবং আলুসির ‘মুখতাসারুত তুহফা’ (পৃঃ ৩৪-৩৫)।

বস্তুত এগুলো যে ইমাম শাফেয়ীর নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। [সম্পাদক]

এ ছাড়াও তারা আরো কিছু কবিতার পংক্তি অসদুপায়ে ইমাম শাফেয়ীর নামে চালিয়ে দিয়েছে। যেমন,

“আমার শাফায়াতকারী হচ্ছেন- আমার নবী, বুতুল,[৯৬] হায়দার,[97] নবীজির দুই নাতি, সাজ্জাদ, বাকের আলমাজদী,

জাফর, বাগদাদে দীর্ঘকাল বসবাসকারী, রেজা, তার কলিজার টুকরারা, দুই আসকারী এবং মাহদী।[98]

আমার ধর্ম হচ্ছে শিয়াবাদ। আমার পরিবার-পরিজন মক্কাতে এবং বাড়ী হচ্ছে আসকালান[99]।

তারা ফাতেমা (রাঃ) কে বুতুল বলে। দেখুন: ‘বিহারুল আনওয়ার’ (৪৩/১১০) ও (৮৭/২১২)।

হায়দার দ্বারা আলী (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে।

দেখুন: ‘আততুহফা আলইসনা আশারিয়া’ (ق৬১/ب) এবং আলুসির ‘মুখতাসারুত তুহফা’ (পৃঃ ৩৫)। এছাড়াও আমি অন্য দুটি পংক্তি পেয়েছি। যে পংক্তিদ্বয় শব্দ ও মর্মের দিক থেকে এ দুটি পংক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ঐ পংক্তি দুটি একজন ইমামিয়া শিয়ার। মাজিনদারানীর ‘মানাকিবু আলে আবী তালেব’ নামক গ্রন্থে তা উল্লেখ করা হয়।

কতই না উত্তম আমার জন্মস্থান! কতই না গৌরবময়! আমার মাযহাব হচ্ছে জগতের সেরা মাযহাব![100]

নবীর বংশধর হচ্ছে আমার মাধ্যম, তারাই আপনার কাছে আমার ওছিলা।

আমি আশাবাদী আগামীকল্য আমার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।"[101]

সম্ভবত এই পংক্তিটি দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, গাজাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্মের পর মক্কায় আসার পূর্বে তাকে আসকালানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

রাযির 'মানাকিবু শাফেয়ী' (পৃঃ ১৪০)।

রাযির 'মানাকিবু শাফেয়ী' (পৃঃ ১৪১), তার কাছ থেকে ড. মুহাম্মদ ইয়াকুন 'দিওয়ানুশ শাফেয়ীতে উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৫৪), কিন্তু ইমামিয়া শিয়া মুহাম্মদ ইবন শাহর আ-শুব মা-জিনদারানী এ পংক্তিদ্বয়কে মুহাম্মদ ইবন সমরকন্দীর বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: মানাকিবু আলে আবী তালেব (২/১৫২)। পক্ষান্তরে সুন্নী আলেম ইবনে হাজার হাইতামী এই পংক্তিদ্বয়কে ইমাম শাফেয়ীর কবিতার পংক্তি বলে দৃঢ় মত পোষণ করেছেন। আল্লাহ্ তাকে মাফ করুন।[আস সাওয়াইক ২/৫২৪]

একবার ইমাম শাফেয়ীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সাথে খলিফা হারুনুর রশীদের কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। খলিফার প্রতি অপবাদ দেওয়া ও খলিফাকে উৎখাতের অভিযোগে ইমাম শাফেয়ীকে আরো দশজন আলাউয়ীর সাথে বাগদাদে খলিফার দরবারে ধরে আনা হয়। এ ঘটনাকে ইমামিয়া শিয়াদের অনেকে দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু শিয়া ছিলেন।[102]

এ অভিযোগের জবাব হচ্ছে-

'ইমাম শাফেয়ীর প্রতি রাফেযীবাদের যে অভিযোগ তোলা হয়' তা তার সম্পর্কে সহীহ সনদের ভিত্তিতে যে অগণিত, অসংখ্য মুতাওয়াতির বর্ণনা এসেছে এবং তার যেসব বাণী সংরক্ষিত আছে তার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ রাফেযীদের প্রতি যে মনোভাব পোষণ করতেন তার সাথেও এ অভিযোগ সাংঘর্ষিক। ইমাম শাফেয়ী

দেখুন: রাযির 'মানাকিবু শাফেয়ী' (পৃঃ ১৪১), ইবনে কাছীরের 'ত্বাবাকাতুশ শাফেয়িয়্যাহ্' (ভূমিকা: ১৪), 'মানহাজুল ইমাম শাফেয়ী' কিতাবের অবলম্বনে (২/৪৯২)।

রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “রাফেযীদের চেয়ে অধিক মিথ্যাবাদী আমি আর কাউকে দেখিনি!?”[103]

ইমাম শাফেয়ীর এ মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে ইমামিয়া শিয়া ইউসুফ আল-বাহরাইনী তার বিদ্বেষপূর্ণ কবিতার পংক্তিতে বলেন-

“ওহে শাফেয়ী, তোমার এ দাবী মিথ্যা; মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্‌র লা‘নত হোক।

বরং তোমার কাছে তোমার ওস্তাদদের ভালোবাসা একদিকে, আর আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ একদিকে।

তোমরা তো এক মাবুদকে বাদ দিয়ে জিবতের, তাগুতের ইবাদত করছো।

হে নাসেবী[104], শরীয়ত ও তাওহীদ থেকে তোরা নাসেবীর দলেরা অনেক দূরে।

দেখুন: ইবনে আবী হাতেমের ‘আ-দাবুশ শাফেয়ী’ (পৃঃ ১৮৯)।

নাসেবী বলা হয় তাদেরকে যারা আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে।

তোরা সামেরীর সাথে গো বৎসকে ইমাম ‘আলী ইবন আবী তালেবের’[105] উপর অগ্রগণ্যতা দিয়েছিস।

তার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাজ ও দখলদার শত্রুদেরকে তোরা একান্তভাবে ভালোবেসেছিস।

তোরা ভালোবাসার দাবী করছিস; অথচ কোনো বুদ্ধিমান, প্রত্যয়ী, সত্যসন্ধানীর কর্ম এমন নয়।

অথচ ভালোবাসার শর্ত হচ্ছে, সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

এর দলীল হচ্ছে কুরআনের বাণী “তুমি পাবে না”। তা কতো আলোকিত ও উজ্জ্বল প্রমাণ।

যদি তাওহীদের বাণী সত্য পথ থেকে বিচ্যুতকারী না হয় তাহলে এর চেয়ে সমুজ্জল, সুস্পষ্ট কোনো দলীল আছে কি?

পূর্ববর্তীদের দোষ ঢাকার জন্য তোরা একটা নীতি গ্রহণ করেছিস;

ইবনে আবী তালেব দ্বারা আলী (রাঃ)কে বুঝাতে চেয়েছে।

তা হলো পূর্ববর্তীদের মাঝে যা ঘটেছে তা থেকে আমরা চুপ থাকব।

যা কিছু ঘটেছে সবকিছুকে আমরা ভাল হিসেবে নিব যেন আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে পারি।

ধিক, শত ধিক এমন বিবেকের জন্য যে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রবঞ্চনার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"তুমি পাবে না" দ্বারা আমরা বুঝাতে চেয়েছি আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণী, 'তুমি পাবে না এমন কোনো কওম - যারা আল্লাহ্‌ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, আবার আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ভালোবাসা রাখে।' [মুজাদালা:২২] অর্থাৎ এমন ব্যক্তি মুমিন নয়। তার ঈমানের দাবী নির্জলা মিথ্যা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কাউকে ভালোবাসার দাবী করে, আবার তার ভালোবাসার মানুষের শত্রুদের সাথেও ভালোবাসা রাখে সেও মিথ্যাবাদী।"[106]

ইউসুফ আল বাহরাইনীর 'আলকাশকুল' (২/১১৭); বৈরুতের আল হেলাল লাইব্রেরী; প্রথম সংস্করণ (১৯৮৬ খ্রিঃ)।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের রাহিমাহুল্লাহ প্রতি ইমামিয়া শিয়াদের অপবাদ

ইমাম আহমাদের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রতি তাদের একটা অপবাদ হলো, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে ওয়াজিব বলেছেন।

এ ব্যাপারে বারো ইমামী শিয়া বায়াযী বলেন, ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত সুন্নী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর প্রতি সামান্যটুকু হলেও বিদ্বেষ পোষণ না করবে"[107] এবং সে দাবী করে যে, 'মুসনাদে জাফর' নামে একটা কিতাব আছে সে কিতাবে এ বর্ণনাটির উল্লেখ আছে।

এ অভিযোগের জবাব:

কোনো ব্যক্তি যদি আপনাকে অজ্ঞাতনামা কোনো কিতাবের রেফারেন্স দেয় তা ন্যায়সঙ্গত নয়। আর যে ব্যক্তি আপনাকে

দেখুন: 'আসসিরাতুল মুসতাকীম' (৩/২২৪)।

অস্তিত্বহীন কোনো কিতাবের রেফারেন্স দেয় তাহলে কি বলা যায়?! বায়াযী ইমাম আহমাদের নামে অভিযোগ দিতে গিয়ে যে কিতাবের রেফারেন্স দিল এ নামে কোনো কিতাবের অস্তিত্বই নেই।

তাছাড়া ইমাম আহমাদ সাহাবীদের ফযীলত বর্ণনা শীর্ষক কিতাবে ১৯৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী শুধু আমীরুল মুমেনীন আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর মর্যাদা বর্ণনা করেছেন।

ইমামিয়া শিয়া নেতা নেয়ামতুল্লাহ্ জাযায়েরী ইমাম আহমাদের ব্যাপারে আরো বেশী কঠোর মন্তব্য করেছে। সে বলে, "ইমাম আহমাদের নির্বুদ্ধিতা:

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল বর্ণনা করেন, যদি কোনো ব্যক্তি শপথ করে 'আমি যদি আজ কোনো নির্বোধের সাথে কথা বলি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক।' এরপর সে যদি কোনো রাফেযীর সাথে কথা বলে তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারণ রাফেযীরা ইমাম আলী 'আলাইহিস সালাম এর বিরোধিতা করে। যেহেতু তিনি (অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু) আবু বকর ও উমরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এ দুজন হচ্ছে জান্নাতের প্রৌঢ় ব্যক্তিদের সর্দার।’[108] আর রাফেযীরা এদুজনকে গালি দেয়।

আমি (নেয়ামতুল্লাহ্) বলব: যে ব্যক্তি এ হাদীস বর্ণনা করে ও বিশ্বাস করে সে-ই নির্বোধ। বরঞ্চ সঠিক বর্ণনা মতে, জান্নাতে কোনো প্রৌঢ়ত্ব থাকবে না, শুধু ইব্রাহীম খলীল ‘আলাইহিস সালাম ছাড়া। কিন্তু তাদের (সুন্নীদের) উদ্দেশ্য ছিল হাসান-হোসাইনের সাথে টক্কর লাগানো। যেহেতু তারা দুজন জান্নাতের যুবকদের নেতা। এটা করতে গিয়ে তারা অবচেতনভাবে স্ববিরোধিতার মধ্যে পড়েছে। আসলে নির্বোধ হচ্ছে সে ব্যক্তি যে বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাথে টক্কর দিতে গিয়েছে, তার কুমতলব অনুযায়ী আমল করেছে এবং স্ত্রীহীন পুরুষের জন্য শ্মশ্রুবিহীন বালককে বিয়ে করা জায়েয বলেছে।”[109]

হাদীসটি ইমাম তিরমিযি তার ‘জামে’ গ্রন্থে (৩৬৬৫), ইবনে মাজাহ্ তার সুনান গ্রন্থে (৯৫), আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে (৬০২) আলী ইবন আবী তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আর ইবনে হিব্বান (৬৯০৪) বর্ণনা করেন আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে।

নেয়ামতুল্লাহ্ জাযায়েরীর ‘যাহরুর রাবী’ গ্রন্থের (পৃঃ ৫২৫), প্রথম সংস্করণ।

অনুরূপভাবে শিয়া নেতা ইলালুশ শারঈ কিতাবের গ্রন্থাকার বলেন, “আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবন ফাযল ইবন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আলমুযাক্কার আন-নিসাপুরী আমাদেরকে নিসাপুরে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমুদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: ‘আলী ইবন আবী তালেব ‘আলাইহিস সালামের সাথে আহমাদ ইবন হাম্বলের শত্রুতার কারণ হলো, তার নানাকে আলী ইবন আবী তালেব নাহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন হত্যা করেছিলেন। যে লোকটির দেহে মহিলার স্তনের মত গোশতের টুকরা ছিল এবং সে ছিল খারেজীদের নেতা।

আবু সাঈদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, ঠিক এই ঘটনাটি সে নিজ কানে ইব্রাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন সুফিয়ানের কাছ থেকেও শুনেছে।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবন ফাযল আমাদের কাছে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমুদ বলেন আমি হেরাতের বিচারক মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন ইয়াকুব আলজুযযানীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন

ফাওরাক আলহারাওয়ীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন আমি আলী ইবন খাশরামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, একবার আমি আহমাদ ইবন হাম্বলের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন আলী ‘আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। তখন তিনি (আহমাদ ইবন হাম্বল) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তি আলীর প্রতি সামান্যতম হলেও বিদ্বেষ পোষণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। আলী ইবন খাশরাম বলেন তখন আমি বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তি আলী ‘আলাইহিস সালামের প্রতি অধিক পরিমানে ভালোবাসা পোষণ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে- আলী ইবন খাশরাম বলেন, তখন তারা আমাকে পিটিয়ে মজলিস থেকে বের করে দিল।

হুসাইন ইবন ইয়াহইয়া আলবাজালী আমাদের কাছে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাদের কাছে আমার পিতা ইবনে ‘আউনের মাধ্যমে আতা ইবন সায়েব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উবাদাহ ইবন সামেত আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যদি তুমি

দেখতে পাও যে, কোনো আনসারী সাহাবী আলী ইবন আবী তালেবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে তখন জেনে রাখ যে সে আগে ইয়াহূদী ছিল।”[110]

সাদুকের ‘ইলালুশ শা-রাঈ’ (পৃঃ ১৭৮), মুআসসাতুল আলামীর প্রথম সংস্করণ (১০৪৮ হিঃ)।

এগুলো সম্পূর্ণরূপে বাজে বর্ণনা, এগুলোর কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ইমাম আহমাদ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বিরোধিতা করেন নি। আর উবাদা ইবন সামেতও এ ধরনের কোনো কথা বলেন নি। [সম্পাদক]

শেষ কথা

সবশেষে এই রিসার্স পেপারের সার-সংক্ষেপ হিসেবে আমরা বলব যে, এটাই হচ্ছে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের চারজন ইমামের প্রতি তথাকথিত বার ইমামের অনুসারী ইমামিয়া শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি। যা তাদের কিতাবাদির গর্ভে লুপ্ত আছে। তাদের বড় বড় ব্যক্তিরা এ নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলে না। যেন তারা শিয়া ও সুন্নীদের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখতে পারে।

সার-সংক্ষেপে আমরা এও বলব যে, আবু হানীফা, মালেক, শায়েফী ও আহমাদ ইবন হাম্বল (রাহিমাহুমুল্লাহ্) এই চারজন ইমামের প্রত্যেকে আহলে সুন্নাহর (সুন্নাহ্র অনুসারীরা) ইমাম। তাদের মাযহাবগুলো হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবীদের মতামতের আলোকে ইজতিহাদ নির্ভর ফিকহী মাযহাব। (অর্থাৎ কোনটা হালাল, কোনটা হারাম এসব বিধি-বিধান নিয়ে যে মাযহাবগুলোতে আলোচনা করা হয়।) এই মাযহাবগুলোর মতভেদ আকীদা বা ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে নয়। যেহেতু ইসলামের ধর্মবিশ্বাস একটাই।

নিঃসন্দেহে ইমামিয়া শিয়াদের চাইতে আহলে সুন্নাহ্, বিশেষতঃ এই চারজন ইমাম আহলে বাইতের ইমামদের আরো বেশী ঘনিষ্ঠ অনুসারী এবং তাদের চাইতে আরো বেশী ভালোবাসা পোষণকারী। যারা আহলে বাইতের ইমামদের নির্দেশ অমান্য করে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত বানিয়ে বানিয়ে অসুদোপায়ে আহলে বাইতের নামে চালিয়ে দেয়। অথচ সেসব মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে খলিফাতুল মুসলেমীন আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং আহলে বাইতের ইলমদার, দ্বীনদার অন্যান্য ইমামরা সম্পূর্ণ মুক্ত।

বারো-ইমামের অনুসারী শিয়ারা সাহাবীদের প্রতি অপবাদের ঝড় তোলার পর এই চার ইমাম ও তাদের মাযহাবকে সবচেয়ে বেশী অপবাদের তীরে বিদ্ধ করে। তাদের এসকল অপবাদ সম্পূর্ণ প্রমাণহীন। তাদের এসকল অপবাদের পক্ষে না কোনো নকলী (কুরআন-সুন্নাহ, সালাফদের বাণী) দলীল আছে, আর না আকলী (যুক্তিনির্ভর) দলীল আছে। বরং তারা অন্যায়ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এসব অপবাদ দিচ্ছে নতুবা বলতে হবে তাদের মতিভ্রম ঘটেছে।

ইমাম শাফেয়ীকে রাহিমাহুল্লাহ শিয়া মতবাদের প্রতি অনুরক্ততার অপবাদ দেওয়া সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইমাম আহমাদের রাহিমাহুল্লাহ একটা কিতাব আছে সাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে। সে কিতাবের বিশাল একটা অংশ জুড়ে আছে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর ফযীলতের আলোচনা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ‘ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে ওয়াজিব বলেছেন’ এ ধরনের অভিযোগ ডাহা মিথ্যা।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব্ব আল্লাহ্‌র জন্য। আর আল্লাহ সালাত, সালাম ও বরকত পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতি এবং নবীর পরিবার-পরিজন, তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতিও অনুরূপ হোক।